প্রকৃতির পরিহাস

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকৃতির পরিহাস

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে আরো দুটি গল্প সংযোজিত হলো। "পুত্রচরিত" ও "১৭১ হেনরিয়েটা রোড" ১৯৩৩ সালে লেখা, সুতরাং প্রথম সংস্করণের গল্পগুলির সমসাময়িক।

১৯৪৫ অন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বয়স্যবরেষু—

এই পুস্তকের রচনাকাল

১৯৩২-৩৩

নিজয়বন্দী

ভেবেছিলুম, বলব না।

যা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, যা জগতে কারুর কোনো কাজে লাগ্‌বে না, শুনে বন্ধুরা লজ্জিত ও শক্রুরা উল্লসিত হবে অথচ কোনো পক্ষ বিশ্বাস করবে না, তা আমার সঙ্গে আমার চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাক্ এই ছিল আমার অভিলাষ। কিন্তু বয়স যতই বাড়্‌ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর উপর কর্ত্তৃত্ব ততই কমে আস্‌ছে, আর সম্প্রতি অহিফেন অভ্যাস করে অবধি মুখ থেকে সংযমের বল্‌গা খুলে পড়্‌ছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। বার্দ্ধক্যে নেশার ঘোরে কখন কার সাক্ষাতে কী বলে ফেল্‌ব, আমার মৃত্যুর পরে যখন ভক্তরা আমার প্রত্যেকটি উক্তি স্মরণ করে প্রবন্ধ লিখ্‌বে তখন আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলি অমর হয়ে আমাকে ভাবী কালের নিকট হাস্যাস্পদ করতে থাক্‌বে। এর প্রতিকার আমি জ্ঞান থাক্‌তে স্বহস্তে করে যাবো। সেই কারণে আজ এই আত্মকাহিনী লিখ্‌তে বসা।

উর্ব্বশীর যেমন জন্ম কিংবা শৈশব কিংবা বাল্য কিংবা কৈশোর ছিল না, সে যখন উদিতা হলো তখন যৌবনে গঠিতা, আমারও তেমনি জন্ম থেকে কৈশোর, উপরন্তু যৌবন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত। আমি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলুম তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। বাল্যের কথা ভালো মনে পড়ে না, স্মৃতির চোখে চাল্‌শে ধরেছে, কাছের জিনিসও ঝাপ্‌সা দেখায়। যৌবন যে কোন্‌খান দিয়ে কেমন করে চলে গেল আজ পশ্চাদ্ধাবন করতে গেলে আশ্চর্য্য লাগে। যেন আমাদের

বসন্ত ঋতু। শ্রীপঞ্চমীর সময় একটু উষ্ণ হাওয়া দেয়, দিন দু-তিন মনে হতে থাকে কোথায় কী একটা আয়োজন চলেছে উৎসবের। তারপরেই যা ধুলো, যা গরম!

এই মনে পড়ে, আপনার কথা ভাব্‌বার অবসর পাইনি। গোড়াতে সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হতে গেলে যত রকম উপসর্গ চাই কোনোটা আয়ত্ত করতে পারলুম না। পলিটিক্স কর্‌তে উদ্দীপনা জাত হলো, কিন্তু সে পথে সকলে নেতা, কাকে অনুসরণ কর্‌ব স্থির কর্‌তে পার্‌বার পূর্ব্বে অদৃষ্ট পুরুষ আমাকে ঠেলে দিলেন সেবা-কর্ম্মে। কোথাও প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও মহামারী—কিছু না হোক মেলা বা মিছিল—বছরের পর বছর খাটুতে খাটুতে শরীরটাতে ঘুণ ধরে গেল।

আজ যেমন আমি পাঠক-পাঠিকার আহার-নিদ্রা কেড়ে নিচ্ছি (কিন্তু কেড়ে নিয়ে কর্‌ছি কী! আমার নিজেরই যে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও ইন্‌সম্‌নিয়া!) সেদিন তেমনি আমারও আহর-নিদ্রা ঘুচে গেছ্‌ল। নিদ্রা অবশ্য বিনা পয়সায় পাওয়া যেতো, কিন্তু আহারের সংস্থান সব দিন ছিল না। কঙ্কালসার মূর্ত্তি নিয়ে আমি অবশেষে উঠ্‌লুম্‌ মধুপুরের এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কী জানি কেন জীবনটার প্রতি আমার মায়া ছিল। বাল্যকালাবধি যে অনাথ, যার উপার্জ্জনের উপর কেউ নির্ভর করে না, যাকে মেয়ে দিতে কোনো দিন কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণ এগিয়ে আসেননি, জীবনবীমাওয়ালাদের কাছে যার জীবনের দাম কানাকড়ি, তাকেও কেন জানি বেঁচে থাক্‌তে হবে।

মধুপুরে বেশীর ভাগ সময় বিছানায় পড়ে কাটুত। উঠে-বস্‌তে বল পেতুম না। না কোনোদিন আড্ডা দিয়েছি, না খেলেছি তাশ পাশা ব্যাড্‌মিণ্টন। ওদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করিনি, কর্‌লেও

মিশ্‌তে পারতুম না। একা একা থাকি। চোখ বুঁজে ভাব্‌তে থাকি এই জীবনটাকে কাটাতে জান্‌লে কত রকমে কাটানো যেতে পারত। নিজেকে নানা অবস্থায়, নানা পরিস্থিতিতে, নানা মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে কল্পনা করি। সেই সকল মানুষের মনের ভিতরে, চরিত্রের ভিতরে নিজের কল্পনাকে অনুপ্রবিষ্ট করে দিই। তারা যেন আমার কাগজের নৌকা। তারা কোন দিকে ভেসে যায়, তাদের সঙ্গে আমিও ভাসি, ভাস্‌তে ভাস্‌তে দেখি তারা কোন ঘূর্ণীতে ঘোরে, কোন অঘাটে ভেড়ে, কিসের আঘাতে ডুবে তলিয়ে যায়। এক কথায়, কাল্পনিক কাহিনী বানাই। মন্দ খেলা নয়। এ খেলার বিশেষত্ব এতে সাথীর আবশ্যক করে না, সরঞ্জামও লাগে না।

বানানো কাহিনীগুলি মাঝে মাঝে এত ভালো ওৎরায় যে মনে হয় ওগুলি যেন এক একটি অভগ্ন স্বপ্ন, অতি সত্বর লিপিবদ্ধ না করে রাখ্‌লে স্বপ্নেরই মতো মিলিয়ে যাবে কিংবা গুঁড়িয়ে যাবে; পুনরুদ্ধার করতে কিংবা পুনর্ব্বার গড়্‌তে পার্‌ব না। লিখ্‌তে গিয়ে দেখি আরো মজা, কল্পনায় যা অস্পষ্ট ছিল কালির আঁচড় তাকে স্পষ্ট কর্‌লে, যা ছিল মুহূর্ত্তের তা হলো চিরকালের। কল্পনার মতো কলমেরও স্বাধীনতা আছে। আমি ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে ওকে যথেষ্ট বিহার কর্‌তে দিলুম। স্বাধীন লেখনী শব্দচাতুর্য্য, বর্ণনাবিভ্রম, রীতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলল।

গল্পরচনার সেই প্রথম দিনগুলি আমি কোনোদিন ভুল্‌ব না। সে আনন্দের, সে ধৈর্য্যের, সে চমকের, সে আবিষ্কারের তুলনা নেই। আমার মনের মধ্যে এত ছিল। যেন ঘটনা আপনা হতে ঘটে যাচ্ছে, আমি সাক্ষীগোপাল। চরিত্র আপনা আপনি বিকশিত হচ্ছে, নব নব চরিত্র দ্বারে উঁকি মার্‌ছে, পুরাতন চরিত্র ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ

প্রসূত পুত্তলীগুলি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে। ধন্য গল্প লেখক। তুমিই সুখী।

আহার নিদ্রায় অবহেলার ফলে শরীর সারল না। এদিকে স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিচালক একদিন এসে অপমান করে গেল, দু মাসের পাওনা বাকী। পোঁটলাপুঁটলি ফেলে রেখে রাতারাতি উধাও হলুম। ঝুলিতে আমার গল্পগুলির পাণ্ডুলিপি। সহায়সম্বলহীন ভাবে এক মাসিকপত্রের আপিসে যখন গেলুম দারোয়ান আমাকে ফকীর ভেবে ঢুকতে দেয় না। সম্পাদক বললেন "পয়সা খরচ করে ছাপ্‌লেও ছাপ্‌তে পারি, যদি পছন্দ হয়। কিন্তু দাম দিতে গেলে লোকসান যাবে। জানেন তো মশাই, মাসিকপত্রের সম্পাদককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না, মুদি অমনি চাল দেয় না, মেছুনী অমনি মাছ দেয় না, আর সম্পাদকও আপনাদেরই মতো ওসব না খেতে পেলে প্রাণে বাঁচে না।"

যাক্, একটা গল্প তাঁর বিনা পয়সায় পছন্দ হলো, ছাপ্‌বেন বলে আশা দিলেন। নিজের চোখে নিজের নামটা তো ছাপার হরফে দেখ্‌তে পাবো। একটি বন্ধুর ওখানে দু বেলা পাতা পাড়লুম। ওদের বিরাট গোষ্ঠী, আমার মতো সামান্য প্রাণীকে একটা কোণে একটু আশ্রয় দিতে ওদের আপত্তি হলো না।

গল্পটি ছাপা হবার সাত দিন না যেতেই কী করে যে আমাকে খুঁজে গ্রেপ্তার করলে, জানিনে—পুলিশ নয়, অন্য এক সম্পাদক। বললেন, "বিশ্বদেব বাবু না? কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্। আপনার গল্প পড়ে, মশাই, কাল থেকে ধর্‌তে গেল অভুক্ত রয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি আপনাকে হাৎড়ে। কী রিয়ালিস্‌ম্, কী ভূয়োদর্শিতা! বাঙ্গালীর সমাজকে অণুবীক্ষণ দিয়ে আপনার মতো কে এমন করে দেখেছে? বললেই হলো বিশ্বদেব

বিশ্বকবির ছদ্মনাম? বিশ্বকবি কি বাংলাকে গণনার মধ্যে আনেন! আমি ঠিক্ জানতুম এ এক নব আবির্ভাব।" ভদ্রলোক গদগদ ভাবে শেষ কর্‌লেন, "আপনাকে লাভ করে আজ সাহিত্যিক কুল পবিত্র, সাহিত্য জননী কৃতার্থা।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলেও ভদ্রলোক থাম্‌লেন না, নিঃশ্বাস নিয়ে হাত দেখিয়ে আমাকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে নিবৃত্ত কর্‌লেন। "না বল্‌বেন না, বিশ্বদেব বাবু। আমিই আপনার আবিষ্কর্ত্তা, আমিই আপনার অস্তিত্বে প্রথম বিশ্বাসী। নিশিনাথ বড় জোর আপনার লেখা প্রথম ছেপেছে। কিন্তু সাহিত্যের ও কী বোঝে? না বল্‌বেন না। বেশী নয়, একটি।"

ভদ্রলোকের গরজ দেখে আমিও একটু চাপ দিলুম।

"দেখুন মশাই, গল্পলেখককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না।" ইত্যাদি।

ঈষৎ দমে গিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, বেশ, আপনার যখন দরকার, নিতান্তই যখন দরকার, তখন—" পাঁচ টাকার একখানি নোট বহুকষ্টে বার করে বারবার নাড়াচাড়া করে যথাসম্ভব বিলম্ব কর্‌তে থাক্‌লেন। যতক্ষণ তাঁর দখলে থাক্‌বে ততক্ষণ তাঁর, দিলে তো পরের হয়ে গেল।

এমন সময় আমার প্রথম সম্পাদক বোঁ করে কোত্থেকে এসে খপ্ করে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "খবরদার মধুসূদন বাবু। আমার কাগজের বাঁধা লেখককে তুচ্ছ পাঁচটা টাকা অফার করে অপমান কর্‌বেন না। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।"

কয়েক বছরের মধ্যে আমি লক্ষপতি। দশ পৃষ্ঠার গল্প একশো টাকার কমে ছাড়িনে। আমার তেইশখানা উপন্যাসের মধ্যে তিনখানার তেইশটা

সংস্করণ হয়েছে। অপরিচিত সমালোচক অপরিচিত মাসিকের চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে আমার প্রতিভার প্রশস্তি গান করে। সকলের মুখে ঐ এক কথা। বাঙালীর সমাজকে এমন অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ্‌তে আর কারুকে দেখা গেল না।

নারীরাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি তাঁদেরই একজন। আমিও সেই থেকে দাড়ি গোঁপ মুড়িয়েছি। নারী মনের নিভৃত অস্ফুট বার্ত্তা আমিই উদ্ধার করে জগৎকে শোনালুম। নারী যদি হয় লজ্জাবতী লতা আমি নারীর জগদীশ বোস্। মেয়েরা শাড়ী পরে কী ধুতী পরে তাই কোনোদিন মুখ তুলে দেখিনি, মেয়েদের সঙ্গে আমার লক্ষ্মণের সম্বন্ধ। তা হলে কী হয় আমি তাদের অন্তর্য্যামী। আমার তেইশখানা নভেলের কোথাও কেউ নায়িকার রূপ বর্ণনা বেশ বর্ণনা অলঙ্কার বর্ণনা অন্বেষণ করে পাবেন না, কিন্তু পাবেন কী তাদের নিগূঢ় ভাবনা নীরব বেদনা নিস্বার্থ ত্যাগ ও সময় সময় কী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন তারা হতে পারে। কিন্তু তা বলে সয়তান তারা নয়। তারা দেবীই। যাতে তাদের দেবী বলে চিন্‌তে ভুল না হয় সেজন্যে আমি তাদেরকে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধনা করাই। তেমন কৃচ্ছ সাধনা ইন্দ্রের শচী তো দূরের কথা শিবের পার্ব্বতীও করেননি। কাজেই তারা দেবীদের চেয়েও দেবী। বিশ্বদেব ভাদুড়ীর গ্রন্থের বেশ্যারাও ব্রহ্মচারিণী, ঝি-রাও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ে, বিধবারা তো বিশুদ্ধতা মূর্ত্তিমতী। চরিত্রের আদর্শ কঠোর বলেই ওরা হৃদয়হীন, ওরা নির্ম্মম—কার প্রতি? না, প্রেমাস্পদের প্রতি। প্রেমে পড়্‌তে ওরা ত্রুটি করে না, কে যে ওদের প্রেমিক তাও ওরা জানে, কেবল প্রেমের যা সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি সেইটে ওরা কাঁচিয়ে চলে। নায়ক-নায়িকাতে একটা চুম্বন বিনিময়েরও জো নেই, আলিঙ্গন তো অভাবনীয়।

নারীরা তো আমাকে তাঁদের একজন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তরুণরাও আমাকে নিয়ে নারীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছেন, আমি যে তারুণ্যেরও উদ্‌গাতা। আমার নায়কগুলি সাধারণত বাপের পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল, প্রেমে যখন ওরা পড়্‌বেই, না পড়ে ছাড়্‌বে না, তখন ওদের জন্যে সে ব্যবস্থাও আমি করে থাকি। সমাজে বেশ্যা ও বিধবা নামক *দুটি বেওয়ারিশ মাল বিদ্যমান* থাকতে প্রেমিকের ভাবনা কী? কিন্তু প্রেম তো জীবনের সবখানি নয়, ধনের প্রয়োজন, সামাজিক সম্মানের প্রয়োজন। তরুণ মনের বড় সাধের স্বপ্ন প্রেম, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের রৌদ্র এসে স্বপন ভেঙে দিলে তরুণের অন্তর বলে, চাই ধন, চাই মান। আমি রিয়ালিষ্ট বলে খ্যাত কেন? কারণ আমার নায়ক বেশ্যাকে কিংবা বিধবাকে বিবাহ করতে না পেরে রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ করে। জাত কুল গণ গোত্র সমস্তই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে যায়। অধিকন্তু আসে রাশি রাশি টাকা ও প্রভূত মর্য্যাদা।

স্ত্রীপুরুষের মিলিত স্তব ইতিমধ্যে আমাকে গড়ের মাঠের গুণীশ্রেষ্ঠদের মতো অশ্বারূঢ় করেছে। এখন মনে হয় ঐ যেন আমার জন্মগত অধিকার, আমার প্রকৃত স্থান। খ্যাতিকে আমি সহজে গ্রহণ করতে পেরেছি, কোনোদিন তা নিয়ে উত্তেজনা বোধ করিনি। তবু 'ভক্ত' ও 'শত্রু' অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের মতো আমারও অদৃষ্টে জুটেছে। খ্যাতির শুল্ক জোগাতেই হবে—নিরুপায়।

সেই স্বাস্থ্যনিবাসের নাকের কাছে মস্ত বাড়ী করেছি, বিল্ শুধ্‌তে না পারার অপমানকে ব্যঙ্গ করতে। শরীরটা সারেনি, প্রকাশকরা দাদন দিয়ে যেন তেইশখানা হাড় খসিয়ে নিয়েছে। ভক্তরা অনাহূত ভাবে এসে কয়েকদিন আমার এখানে পথ্য ও মাঠে হাওয়া খেয়ে যায়। বলে, "শরীরটাকে সারিয়ে তুলুন, বিশ্বদেব বাবু। দেশ আপনার কাছে

এখনো অনেক আশা রাখে। নোবেল প্রাইজ্ এখনো জল থেকে ডাঙায় তোলার বাকী।" আমার ফটোগ্রাফ ও অটোগ্রাফ নিয়ে এবং আমার বইয়ের এক সেট ওদের উপহার দিতে হবে জানিয়ে ওরা "আবার আসব" বলে পরম আপ্যায়িত করে বিদায় হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য, এই আমার বয়স, এই আমার স্বাস্থ্য, তবু এখনো আমার কাছে জীবনবীমার এজেণ্ট ও বিয়ের ঘটক আনাগোনা করে। তাদের অভ্যর্থনার জন্যে একটা সশস্ত্র গুর্খা পুষেছি, তাতেও ফল হয় না। তারা আসে আমার ভক্তের ছদ্মবেশে। আমার উপন্যাস বাস্তবিক ওরা পড়েছে, কথায় কথায় এর পাকা পরিচয় দেয়। জিজ্ঞাসা করে নতুন কী লিখছি, কবে প্রকাশিত হবে, "বজ্র ও বিদ্যুৎ" গল্পটার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় কী, "কে যায়" গল্পটার শেষ অমন হলো কেন, ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়ে। ভক্তকে ভাগিয়ে দিতে পারিনে। এজেণ্টকে বলি, "কার জন্যে বীমা করবো? আমার তিন কুলে কেউ নেই।" অবশ্য কথাটা সত্য নয়। আমার মাস্তুত ভাইদের খুড়তুত ভাইরা ও পুত্রকন্যারা ঘন ঘন আগমন করায় আমাকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তারা আর কিছু না হোক্ সেকেণ্ড ক্লাস রেলভাড়াটা না পেলে নড়্বে না।

এজেণ্ট বলে, "আপনার মতো লোক স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের স্বার্থ ভাব্লে দেশের অর্থবৃদ্ধি কেমন করে হবে? দেশের কাছে অনেক পেয়েছেন বিশ্বদেব বাবু। দেশকে কিছু দিন্।"

ঘটককে বলি, "বানপ্রস্থের বয়স হলো। এই তো শরীর।"

ঘটক বলে, "আহাহা! ভোগায়তন শরীর। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে বানপ্রস্থের বিধি নেই। শরীরের যত্ন নেবার জন্যে চাই একটি গুণবতী স্ত্রী, তার নাই বা থাকুল রূপ, (রূপ থাকুলে তো তাকে

রূপবতীই বলতুম)। হলোই বা তার কিছু বেশী বয়স এবং পিতা যদি তার দরিদ্র হয় তাতেই বা কী? আপনার মতো পরোপকারী দেশবান্ধব একটি কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করলে চিরকাল নাম থাকবে।"

একটা মোটা গোছের বীমা করতেই হলো। যে আসে তাকে দেখিয়ে বলি, "একটা আছে, আর পারিনে।"

কিন্তু ঘটককে ও কথা বলতে পারি কই?

গোপন করব না। ওদের ইঙ্গিত আমার বড় ভালো লাগে। একটি কল্যাণী বধূ আমার আয়ুর লক্ষণ আপন সীমন্তে ও করযুগলে ধারণ করবে। একটিবার ডাকবে, "ওগো"। একটি শিশুপুত্র বা কন্যা আমার কোলে উঠে একটিবার ডাকবে, "বাবা"। যে লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি তিনি ধন সম্পদের দেবী। যে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আমার ঘরে পড়ল না তিনি মঙ্গলময়ী।

কিন্তু লোকে কী বলবে! আমার তরুণ ভক্তরা করবে না কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, বলাবলি করবে—যে-মেয়ে আমাদেরই কোনো একজনের হতে পারত বুড়োটা তাকে টাকার জোরে আত্মসাৎ করেছে। আমার নারীভক্তরা আর চিঠি লিখে উচ্ছ্বাস জানাবেন না। আমি যে আজন্ম ব্রহ্মচারী, আমি যে কলির ভীষ্মদেব, আমার এই প্রতিপত্তি আমার সোনার মুকুট। একটিবার মাথায় সোলার টোপর পরলে এই সোনার মুকুট চিরকালের মতো খসবে। জানি আমার চেয়ে বয়সে বড় অনেক সাহিত্যিক এখনো দ্বিতীয় তৃতীয়বার সোলার টোপর পরছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন নাকি বিপত্নীক কর্ত্তৃক হবার নয়। কিন্তু আমার তো প্রবৃত্তি হয় না এই বয়সে।

আবার ভাবি কী এমন বয়স। যদি কোনো কল্যাণহস্ত এই রোগাতুর

দেহটার উপর বীণার যষ্টির মতো ছুঁয়ে যায় তবে এরই ভিতর থেকে যে ঝঙ্কার উঠ্‌বে বাংলাদেশ তার অনুরূপ শোনেনি।

না। কোনোদিন ভালো করে স্ত্রীলোকের পানে তাকাইনি। লজ্জাও করে, ভয়ও করে। স্ত্রীলোককে কল্পনা করেই আমার স্বস্তি, প্রত্যক্ষ করতে আমার হৃৎকম্প। এই তো বেশ আছি। তাকে তেইশখানা বই তেইশটি শিশুর মত শোভা পাচ্ছে। দেখে নিঃসন্তানের চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

মনের যখন এইরূপ দোলায়িত অবস্থা তখন একদিন একখানি চিঠি পেলুম। খামের উপরকার লেখা থেকে জান্‌লুম বামা হস্তের লেখা। আর একখানি প্রশংসাপত্র হবে। তবু পড়ে দেখ্‌তে কৌতূহল হলো। যেমন প্রত্যেক বার হয়ে হয়ে থাকে। প্রশংসা জিনিসটা পদসেবার মতো। ক্ষমতাশালীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, অথচ একবার ওর স্বাদ নিলে প্রত্যেকবার নিতে লোভ হয়।

কে একজন মঞ্জরী দেবী বিনয়নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সুমনা চরিত্র আমি কোথায় পেলুম? তাঁর বন্ধুদের ধারণা আমি তাঁকেই মডেল করে সুমনাকে এঁকেছি। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?—তিনি জানতে চেয়েছেন।—আমি কি কখনো তাঁকে দেখেছি? চিনেছি? যদি না দেখে থাকি, না চিনে থাকি, তবে কেমন করে তাঁর মনের ভাবনাগুলি পর্য্যন্ত আয়ত্ত করেছি? আমি কি তাঁর সখীদের মুখে তাঁর মুখের কথা শুনেছি?

আমি একটু রাগই করলুম। প্রকারান্তরে বলা হলো আমি ফোটোগ্রাফার। যা আমার শত্রুরাও কস্মিনকালে বলেনি। নিজের ঘরে বসে নিজের প্রাণের কথা লিখি, কারুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাইনে, অপরে আমার ভবন আক্রমণ করে আমার স্তুতি গান করে যায়

এই তো জানতুম। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের মতো কাপড় পরে না বলে তারাই যে নারী এই অনুমান করি। নইলে নারী বলে যে একটা জাতি আছে তা আমার অজ্ঞাত না হলেও অপরিলক্ষিত। ডাকঘরের সাহায্যে নিরীহ ভদ্রলোককে এমন সুকৌশলে গাল পাড়তে তো দেখিনি। এও এক প্রকার দণ্ড যা খ্যাতিমানকে বহন করতে হয়। চার পয়সা খরচ করে যে কোনো শত্রু সে বেচারার সকাল বেলাটার প্রশান্তি নাশ করতে সমর্থ।

একটা জবাব লিখতেই হলো। রাগ করতে আমিও জানি। কিন্তু এও জানতুম্ যে যা লিখ্ব তা একদিন না একদিন কাগজে ছাপা হবে। প্রসিদ্ধ লেখকের বাজার খরচের হিসাব পর্য্যন্ত ছাপা হয়। লেখনীকে সম্বৃত করলুম। মঞ্জরী দেবী তাঁর নামের অগ্রে বন্ধনী দিয়ে 'কুমারী' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন। লেখার ছাঁদটিও কচি। বয়স বিশের নীচেই হবে যতদূর আন্দাজ হয়। "কল্যাণীয়াসু" ও "তুমি" লিখ্তেই রাগটা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। দেখ্লুম বক্তব্য যা ছিল কেমন করে তা রূপান্তর ধারণ করেছে। "না, আপনাকে জীবনে দেখিনি" এর স্থলে লিখ্লুম, "তোমাকে যদি দেখে থাকি তবে সে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের নিরালায়, আমার আপন মনের মুকুরে। হয়তো তুমি যখন জন্মাওনি তখন থেকে দেখা। আমার আপন আইডিয়া অন্যের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়ে মঞ্জরী নাম নিলে, আমি জান্লুম না, তাকে গ্রন্থে নামিয়ে সুমনা নামকরণ করলুম।"

কয়েকদিন পরে আবার সেই আকারের নীল খাম, সেই হাতের লেখা। খুলতেই একখানি ফোটো ঝুপ করে পড়ে গেল। রূপবর্ণনা আমার আসে না। যা তা উপমা দিয়ে পাছে মহান্কে হাস্যকর করে তুলি সেই ভয়ে মঞ্জরীর প্রতিকৃতিকে বিশ্লেষণ করব না। শুধু এইটুকু

বল্‌ব যে সুমনা যদি কল্পলোক ছেড়ে মরলোকে অবতীর্ণ হতো তবে এই রূপই পরিগ্রহ করত।

লিখেছে, রাম না হতে রামায়ণ কেমন করে রচিত হয়েছিল তা একদিন বিশ্বাস করেনি। মনের প্রবণতা সংশয়ের দিকে। মা পুরাণকে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করেন এজন্যে তাঁর সঙ্গে কত তর্ক করেছি। আমার এই যে অতিমানুষিক পুরোদৃষ্টির পরিচয় হাতে হাতে পেলে এতে ওকে সংশয়বাদীর প্রতি সংশয়াপন্ন করেছে। ওর ফিলসফীর ছাত্রী হওয়া বৃথা। ফিলসফীতে তো এই রহস্যের নিরাকরণ নেই। অবশেষে সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদন করেছে, "হে মনোজ্ঞ মনীষী, আমার প্রণতি গ্রহন করুন।"

পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, "একখানি স্ন্যাপ্‌শট পাঠাতে হঠাৎ খেয়াল হলো।"

এর উত্তরে আমার কিছু বল্‌বার ছিল না। ছবিখানাকে অতি সন্তর্পণে বাক্সবন্দী করলুম, বাইরে রাখ্‌লে পাছে কেউ ভুল ভাবে। মাঝে মাঝে বাক্স খুলে আলোয় তুলে দেখি। আমার মানসে সুমনার যে প্রতিমা ছিল এ কি সত্যই সেই? হাঁ, সেই। "মনোজ্যোৎস্না" যদি নাট্যাকারে অভিনীত হয়—যেমন আমার "পেয়ালা প্রেমিক" হয়েছে—তবে মঞ্জরীকে সুমনার ভূমিকায় নিখুঁৎ মানাবে। ইতিমধ্যে একখানা নতুন উপন্যাস আরম্ভ করেছিলুম। তাই নিয়ে এত নিবিষ্ট ছিলুম যে দাড়ি কামাতে ভুলে যাবার মতো মঞ্জরীর ছবি দেখাও ভুল্‌লুম।

কিন্তু ভুল্‌তে দেয় কই? আবার সেই খাম, সেই গোটা গোটা অক্ষরে আমার নামঠিকানা।—"আমার প্রতিদিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থ। এক পৃষ্ঠার একখানি চিঠি লেখা আপনার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আপনার এক একটি ছত্র আমার খাদ্য পানীয়। আপনার বাণীর আলোকে আমি জীবনের

পথ দেখ্‌তে পাই। সুমনাকে অনুসরণ করে চলেছি—আমার পুরশ্চারিণী ছায়া সে।"

এর পর কোন ভক্তের ভগবান স্থির থাকতে পারেন?

"বৌ কথা কও" লিখ্‌তে লিখ্‌তে আলাদা কাগজে মঞ্জরীকে চিঠি লিখ্‌তে সুরু করি। কিন্তু লেখ্‌বার কী আছে? আমার বাগানের ডালিয়া, আমার বাঘা কুকুর, আমার মালীর হাবা ছেলে, এদের বর্ণনা দিয়ে কোনো মতে একটি পৃষ্ঠা ভরানো গেল। লেখ্‌বার হাত যার আছে তার হাতের ছাইভস্মও সোনা আনে।

এমনি করে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল। কিন্তু মঞ্জরী ছাড়ে না। তার দাবী সে তার পরবর্ত্তী পত্রে পরিস্ফুট করলে। সে চায় সাত দিনে একখানা করে আমার চিঠি। চাইলেই পারত সাত দিনে একবার করে আমার ফাঁসি। বুঝ্‌ল না যে দর্শনের ছাত্রীকে লেখ্‌বার মতো বিষয় আমি কোথায় পাবো। বিশ্বকবি "ভূমা" লিখে প্রকারান্তরে বলে থাকেন "ঘুমা"। আমার অমন কোনো Code Word নেই। পাঠক-পাঠিকাকে ঘুম পাড়াবার বায়না দিয়ে বিধাতা আমাকে পাঠাননি। বিষয়ের অভাবে অগত্যা তার সেই স্ন্যাপ্‌শটখানা—যার সম্বন্ধে আগের বারে অভিমত দিইনি বলে সে অভিমান জানিয়েছে—তার সম্বন্ধে আমার ধারণা জ্ঞাপন অর্থাৎ গোপন করলুম।

এর পর সে লিখ্‌লে, সে যে বাস্তবী নয়, সে যে আমার কল্পলোকের বাসিন্দে, ক্রমশ তার চেতনার ভিতর এই অনুভূতি ব্যাপ্ত হচ্ছে। সে মঞ্জরী নয়, সে সুমনা। সে পৃথিবীতে নেই, সে আছে সেই অমর্ত্ত্য জগতে যে জগতে আছে "মনোজ্যোৎস্না"র অন্যান্য চরিত্রগুলি—কুমারেশ, অপরাজিতা, পাঁচু খানসামা, জগু মালী, টম কুকুর। মঞ্জরী হিসাবে তার যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে মরে যাবে। সুমনা হিসাবে সে

অমর। আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, আমি তাকে প্রাণলোক থেকে তুলে নিয়ে অমর লোকে পৌঁছিয়ে দিলুম।—একটি মরা গোলাপ ফুল চিঠির গায়ে এঁটে দিয়েছে।

এরূপ এক একখানা চিঠি আমাকে অভিভূত করে আমার বিবেকে নাড়া দিয়ে যায়। সুমনাকে মঞ্জরী ও মঞ্জরীকে সুমনা বলে প্রতারণা করলুম না তো? অতিরঞ্জন? না, না। সত্যই বলেছি। কবি তার কল্পনার উপাদান এই পৃথিবী থেকে আহরণ করে। কখনো সজ্ঞানে, কখনো অজ্ঞাতসারে। সেই উপাদান দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে গড়ে মানব-মানবীর মূর্ত্তি। অবশেষে একদিন ঐ মূর্ত্তিগুলিকে প্রত্যর্পণ করে পৃথিবীরই হাতে। ওদিকে অনুরূপ উপাদান দিয়ে প্রকৃতিও মাতৃগর্ভের অন্ধকারে মানব-মানবীর মূর্ত্তি বানায়, যথাকালে ঐ মূর্ত্তিগুলিকেও পৃথিবীরই কোলে তুলে দেয়। দুই সেট মানবমানবীমূর্ত্তির মধ্যে এমন দুটি কি খুঁজ্‌লে মিল্‌বে না, যাদের সাদৃশ্য কেবল ভাবের নয়, রূপেরও? মনের নয়, মুখেরও? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু সত্য। হোরেশিওর ফিলসফীতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে না, কিন্তু হ্যাম্‌লেট একে স্বচক্ষে দেখেছে।

আমি অভিভূত হয়েছিলুম মনে পড়ে। মঞ্জরীকে লিখেছিলুম তার চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন হলে আমি অর্থ সাহায্য করতে পারি। চিঠিখানা ডাকে দিয়ে ভাবনা হয়েছিল ওখানা হয়তো কোনোদিন ছাপা হবে, তখন শত্রুপক্ষ ওর বিরূপ ব্যাখ্যা করবে। করুক, কিন্তু মঞ্জরীর বেঁচে থাকা তার নিজের পক্ষে যেমন আবশ্যক, তেমনি আমার পক্ষেও। কল্পিতাকে জীবিতা বলে জানা অসাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়, জগতে এর পূর্ব্বে এমনটি ঘটেছে কি না সন্দেহ। গ্রীক ভাস্কর পিগ্‌মেলিয়ন তাঁর স্বনির্ম্মিত শিলামূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার দেখেছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

সে শুধু প্রবাদ। গ্রন্থের নায়িকা গ্রন্থকারের সুমুখে উপস্থিত হয়ে কোনোদিন কি বলেছে, "আমি শকুন্তলা" বা "আমি মিরান্দা" ?

আমার মৃত্যুর পর আমার এই ডায়েরী পড়ে বন্ধুরা বল্‌বেন, বুড়ো বয়সে আফিং ধরে বিশ্বদেবদার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়সে নিশ্চয়ই তিনি এই তরুণীকে শিশু অথবা বালিকা রূপে কোনোদিন দেখে তারপর সম্পূর্ণ ভুলে গেছ্‌লেন, গল্পের মধ্যে বিস্মৃতির অর্গল খুলে গেল। একটু খোঁজ কর্‌লে প্রকাশ পেতো যে যমুনা নদীর বন্যায় দাদা একে ভেসে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।

শত্রুরা বল্‌বে, বিশ্বদেব বুড়োর বুদ্ধিভ্রংশ যে হয়েছিল সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে তার সঙ্গে কিছু অসাধুতাও ছিল। সোজা লিখ্‌লেই হতো যে মেয়েটিকে তিনি কোনোদিন চাক্ষুষ দেখেননি, সুমনা চরিত্রটি কল্পিত। লিখ্‌লেন কিনা মেয়েটিকে তিনি তার জন্মের আগে দেখেছেন। দ্বিতীয় সিরাজুদ্দৌলা! বোকা মেয়ে এই পড়ে সগর্ব্বে পাঠালে তার ছবি। সে ছবি আমাদের চোখে পড়েনি, তবু আমরা জোর করে বল্‌তে পারি যে সুমনার যে ছবি বইতে ফুটেছে—অর্থাৎ ফোটাবার নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়েছে—সে ছবির সঙ্গে ও ছবির সাদৃশ্য থাকতে পারে না। কিন্তু নেশার ঘোরে বৃদ্ধ মহারথী লিখ্‌লেন কিনা একই ছবি। এর পর যদি মেয়েটির যক্ষ্মা না সারে, যদি পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা ত্যাগ করে অলসভাবে ধ্যান কর্‌তে থাকে যে সে সুমনার মতো তিল তিল করে মর্‌লে সেইটেই হবে রোমান্টিক মৃত্যু, তবে সেই বিপত্তির জন্যে দায়ী আমাদের পরলোকগত নারীঘাতক বিশ্বদেব ভাদুড়ী।

দুই পক্ষেই ভুল কর্‌বেন গোড়াতেই। তাই এ স্থানে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলি যে মঞ্জরীর সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহার কালে আমার কোনো

প্রকার মৌতাত ছিল না। বাকীগুলো আমি সংশোধন না করলেও ভাবীকাল করবেন। অতএব মঞ্জরীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

মঞ্জরী লিখলে, আমি যে ওর চিকিৎসার জন্যে অর্থসাহায্য করতে ইচ্ছুক এতে আমার মহানুভবতার—মহামানবতার—আর একটি নিদর্শন পেয়েছে। কিন্তু কী লাভ! এই একই রোগে তার বাবা মারা গেছেন, তার দাদাও। এমন কেউ নেই যার জন্যে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। মা অবশ্য আছেন এবং মামারা। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ নেই। শুধু রক্তের সম্বন্ধ। ওঁদের চেয়ে আমি তার আত্মীয়তর। কিন্তু আমার জন্যে বাঁচা ও মরা দুই সমান। চিরকাল আমার সৃষ্টিতে সে থাকবে।

আমারও মনে হয় ও যে বাঁচতে চাইলে না এর সত্যিকার কারণ "মনোজ্যোৎস্না"র সুমনাও বাঁচেনি। সুমনাকে সে অনুবর্ত্তন করছিল চোখ বুজে। আমি যদি সুমনাকে দিন দিন মিলিয়ে যেতে না দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতুম তা হলে একখানা উপন্যাস মাটি হতো, কিন্তু একটি মানুষ বাঁচবার প্রেরণা পেতো। Goethe তাঁর "Werther" লিখে কত যুবকের আত্মহত্যার হেতু হলেন, ভাবীকাল "মনোজ্যোৎস্না"র লেখককেও কত মঞ্জরীর মৃত্যুর ভাগী করবে। কী কুক্ষণেই "মনোজ্যোৎস্না" লিখেছিলুম ও কেন মঞ্জরীকে মিথ্যা বলিনি এ জন্যে আমার পশ্চাত্তাপ হয়। স্বয়ং যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিলেন, আমিও বললে পারতুম। কিন্তু আমার তো পুরোদৃষ্টি ছিল না। আমি দৈবজ্ঞ নই, জানতুম না যে মঞ্জরীর যক্ষ্মা দেখা দেবে।

আর একদিক থেকে যদি ভাবি তো পরিতাপের অবকাশ থাকে না। "মনোজ্যোৎস্না"র সুমনা ফুলের গন্ধের মতো মিলিয়ে গেল, পৃথিবীর রূঢ়তা তার সইল না। সুমনার সঙ্গে মঞ্জরীর যখন এমন অলৌকিক,

সাদৃশ্য তখন দু জনের যে একই পরিণাম হবে এ তো বিধাতার বিধান। এমন তো হতে পারে যে কুশ-লবের মুখে রামায়ণ গান শোন্‌বার পরে সেই গানের বিবরণকে অনুসরণ করা হলো রামচন্দ্রের শেষ জীবনের কাজ ও সে কাজ সাঙ্গ হলো তাঁর তিরোধানে।

মঞ্জরী যে সুমনা এ বিষয়ে তার সংশয়রাহিত্য তাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছিল। যা অনিবার্য্য তার গায়ে ডাক্তারী কবিরাজী ইত্যাদি নানা প্রকার ঠেকা দিতে তার আপত্তি ছিল। তার মা ও মামারা অবশ্য নিজেদের কর্ত্তব্য কর্‌ছিলেন। কিন্তু কালো মেয়েকে বাঁচাতেই হবে এ রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁদের ছিল না। তার বেঁচে থাকা এমন কী জরুরী। লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন, যাতে সে জীবনে একটা অবলম্বন পায়। তাঁরা তাকে সমুদ্রের ধারে বাস কর্‌তে নিয়ে গেলেন ও আশা কর্‌লেন যে ওই তার জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতি সপ্তাহেই পুরী থেকে পেতুম সেই নীল খাম, সেই হাতের লেখা। মৃত্যুর ধীর পদক্ষেপ তাকে চকিত করেনি। তাড়াতাড়িতে লিখ্‌ছি, ভুল-চুক মাফ কর্‌বেন। এমন ভাব সে লেখনীর গতিতে ব্যক্তি করেনি, লেখাতেও না। যা ঘট্‌বার তা ঘট্‌তে যাচ্ছে, ত্বরার অর্থ নেই, শঙ্কাও অমূলক। দশ এগারো মাস এই ছিল তার ধারা। তারপর হঠাৎ তার অসুখ গেল বেড়ে। ডাক্তার তাকে চিঠি লিখ্‌তে নিষেধ করে দিলে। লুকিয়ে লিখ্‌তে গিয়ে সে ব্যস্ততা ও উত্তেজনা প্রকাশ কর্‌লে। আমাকে একবার দেখ্‌তে চাইলে।

এতদিনের জানাশুনা। তবু সাক্ষাৎ কর্‌বার কথা কোনোদিন মনে ওঠেনি। প্রস্তাবটা আমাকে বিব্রত করে তুলল। দেখতে না পেলে মঞ্জরী খেদ নিয়ে মর্‌বে। আর যাওয়া কি আমার মতো প্রসিদ্ধ লোকের

পক্ষে মুখের কথা ? আমার গতিবিধির পর সমগ্র দেশের নজর। আমি আমার দেশবাসীর নজরবন্দী। খবরের কাগজের রিপোর্টার আমার উপর পাহারা দিচ্ছে। মধুপুর থেকে কল্‌কাতা গেলে সাড়া পড়ে যায়, হাওড়া ষ্টেশনে ক্যামেরা ও অটোগ্রাফের খাতা ছুটো করে পায়ের উপর ভর দিয়ে ভিড় করে আসে। পুরী যাচ্ছি, টের পেলে স্পেশ্যাল রিপোর্টার সঙ্গে চল্‌বে। মঞ্জরীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কী অপরূপ রোমান্স রচিত হবে কে জানে ? বন্ধুরা লজ্জিত হবে, শত্রুরা টিট্‌কারী দেবে, বেচারী মঞ্জরী মরেও নিষ্কৃতি পাবে না। তার নাম মুখে মুখে ছড়াবে, ইতরগুলো তার নামে ছড়া কাট্‌বে।

না, মঞ্জরী, যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমাকে তো তুমি মাসিকের সাপ্তাহিকের দৈনিকের ছবিতে দেখেছ। আমার বাণীও সপ্তাহে সপ্তাহে শুনেছ। দেখাশুনার কিছু বাকী আছে কি ?

আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল টপ টপ করে পড়ে আমার নূতন উপন্যাস "সতীর সতীন"-এর পাণ্ডুলিপি ভিজালো, অক্ষর মুছে দিলে। সে যে মরণাপন্ন এ জন্যে নয়, মৃত্যু যার অবধারিত তার জন্যে শোক করে কী হবে ? আমি যে তার সামান্য প্রার্থনাটুকু পূরণ কর্‌তে পার্‌লুম না ক্ষোভ এই জন্যে। আমি লক্ষপতি, রেলভাড়ার জন্যে ভাবিনে। গরীব কেরাণীর মতো ছুটী চেয়ে পাইনি এও নয়। আমার ভয় আমার স্তাবকমণ্ডলীকে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে। যতদিন অখ্যাত সেবাকর্ম্মী ছিলুম, ততদিন মানুষকে ভয় করিনি। আজ আমার খ্যাতি আমাকে রেল প্ল্যাটফর্মের পানবিড়িওয়ালার নিন্দাভীরু করেছে।

দিন কয়েক পরে মঞ্জরীর বড় মামার পত্র পেলুম। যা অনুমান করেছিলুম তাই—মঞ্জরী নেই। যা অনুমান করিনি তাও ছিল। মঞ্জরী নাকি মৃত্যুকালে বলে গেছে যে আমি তার স্বামী।

বড় মামা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তা কেমন করে হলো। যেমন করেই হোক্‌ মঞ্জরীর মা সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন জামাতা বাবাজীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে।

আমি আফিং ধর্‌লুম।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া

আমি বয়সে তরুণ না হলেও আমার মনটা তরুণ এবং আমার লেখনী তারুণ্যের লক্ষণাক্রান্ত। তাই দশটা তরুণ লেখকের নাম কর্‌তে বললে লোকে আমার নামটাই করে সব আগে, আর গালাগাল যখন দেয় তখন আমাকেই দেয় সব চেয়ে বেশী। তা দিক্, নিন্দায় আমার আয়ু কমে না, তাই মনটাও তরুণ থাকে। উপরন্তু আমার নামটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক বিনা পয়সায় আমাকে বিজ্ঞাপিত করে। আমার কার্টুন যা ছাপে তা আমার চেহারার চেয়ে দেখতে ভালো। ট্রামে ট্রেনে বাসে মেসে আপিসে চায়ের দোকানে আমার নাম যতবার ওঠে কোনো ঠাকুর-দেবতার নাম ততবার ওঠে না। এখানে বলে রাখি আমি যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কটাক্ষ কর্‌লুম তাঁরা সশরীরে বর্ত্তমান। না, আরো খোলসা করে বল্‌ব না।

সুখ্যাতি ও অখ্যাতির মধ্যে প্রভেদ যাই থাক্ উভয়েই খ্যাতি। আমি খ্যাতি ভালোবাসি। পথে যেতে যেতে যখন কানে পড়ে কেউ ফিস্ ফিস্ করে অন্য কাউকে বল্‌ছে, "ইনিই তরুণ সাহিত্যিক মহেশ মহলানবীশ" তখন আমি অনেক কষ্টে আনন্দ সম্বরণ করে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করি।

আমাকে খ্যাতির চেয়েও যা উৎফুল্ল করে তা তরুণ সাহিত্যিকদের খাতির। তাদের সকলে যে সাহিত্যিক এটা একটু বাড়িয়ে বলা, হয়তো বানিয়ে বলা। কিন্তু তারা সকলেই তরুণ—বয়সে তরুণ। সন্ধ্যাবেলা তারা কম্পাসের দশটা দিক্ থেকে উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো আবির্ভূত হয় এবং আমার বৈঠকখানায় বসে আমার চা-সিগারেট উজাড় কর্‌তে কর্‌তে

আমার গল্প উপন্যাস নিয়ে যতটা মেতে ওঠে ঠাকুর-দেবতাদের কথা শুনলে ততটা তেতে ওঠে। আমি যে তাদের একজন এই আমার গূঢ়তম সুখ। তারা যে আমাকে দাদা বলে, মামা কিংবা খুড়ো বলে না, এই আমার আতিথেয়তার চরম পুরস্কার। তারা আমাকে তাদের নিজের নিজের রচনা দেখতে দেয়, আমি আগাগোড়া পড়্‌বার ফুরসৎ পাইনে, পেলেও পড়্‌তে তন্দ্রা বোধ কর্‌তুম। তবু ঐ সব একসারসাইজের দু'চার জায়গায় দাগ দিয়ে মনে রেখে দিই, কথায় কথায় উদ্ধার করে লেখকদের উদ্ধার করি। ওরা অবাক, কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়। ওদের রচনার যেটুকু ওদের স্বকীয়, যেটুকু ওদের তারুণ্য, ওটুকু আমি চোখ দিয়ে আত্মসাৎ করি। কারুর আইডিয়া, কারুর ভঙ্গী, কারুর শব্দচাতুরী। তবে গল্পের প্লট যখন চুরি করি তখন জানিয়ে শুনিয়ে চুরি করা নিরাপদ জ্ঞান করি। "ওহে শৈলেশ, তোমার ঐ গল্পটা আমার এমন ভালো লেগেছে যে, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই—তুমি তোমার প্লটটি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" শৈলেশ বোধ করি ওটা কোনো কন্টিনেণ্টাল নভেল থেকে টুকেছে। ও কাজ কর্‌তে তার কুণ্ঠা নেই। আর আমিও ব্যস্ত মানুষ। কন্টিনেণ্টাল নভেল পড়ি কখন। এতে আমি অন্যায় কিছু দেখিনে। প্লটের গায়ে কপিরাইট লেখা নেই। কন্টিনেণ্টালরাও যে কার কাছ থেকে সরিয়েছে কে বল্‌তে পারে। স্বয়ং সেক্‌স্‌পীয়ার দু'হাতে প্লট লুট করেছেন। "পূর্ণ শশী মাখে মসী কালো বলুক দেখি?" সেক্‌স্‌পীয়ারের বেলা কোনো শ্বশুরপুত্র অপহরণের অপবাদ দেয় না!

আমার তরুণ ভাইগুলির মধ্যে স্মরজিৎকে আমি একটু বিশেষ স্নেহ করি। ও আমার প্রশংসা করে ক্লান্ত হয় না। ও আমার চোরাই

প্লটের উপর বাটপাড়ি করে। ভাষা নকল করে, শিরোনামা জাল করে। আর তামাসা দেখুন, আমার হাতে দিয়ে বলে, "দাদা, একবারটি দেখে দিন।" আমি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, "সাবাস।" সে যদি সত্যি সত্যি আমার ভাত মার্‌তে পার্‌ত তা হলে আমি তাকে ধম্‌কে দিতে ইতস্তত কর্‌তুম না। আমি জানি আমার একটি গুণ আছে যা বাংলা দেশের অন্ত কোনো সাহিত্যিকের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীষী। কিন্তু দেশের নাড়ী নক্ষত্র তো জান্‌তে আমার বাকী নেই। ওরা ভাজে ঝিঙে, বলে পটল। আমিও তুলি পাঁক। কিন্তু তার অঙ্গে একটু গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে দিই। আমার গল্পের গন্ধ শুঁকে পাঠক ভাবেন পুণ্যার্জ্জন কর্‌ছেন। কারণ পাপকে আমি ঘৃণ্য ভাবে দেখাই সমাজকে পাপমুক্ত কর্‌তে। আমার বইয়ের শেষ পাতাটা আগে পড়্‌বেন। দেখ্‌বেন পাপের শাস্তি আছেই। অন্তত পাপীর ব্যর্থতা আছে, ভয়ঙ্কর ব্যর্থতা। এই তত্ত্বটি স্মরজিৎ আবিষ্কার করেনি। তার যেমন মোটা বুদ্ধি কর্‌তে পার্‌বেও না। তাই তার বইয়ের বিক্রি হবে না। পরন্তু সমালোচকরা তাকে বল্‌বে মহেশ মহলানবীশের নকলবীশ।

স্মরজিৎকে আমি বিশেষ স্নেহ করি তার আরো একটা কারণ আছে। সে হোল কানাই বাচস্পতির ছেলে। "উল্টা রথ" প্রণেতা প্রাচীনত্বের পুরোধা কানাই বাচস্পতিকে কে না চেনে? দৈনিক পত্রে প্রতিদিন ওর দেড় কলম বরাদ্দ। লাইন পিছু এক আনা পায়। তা হলে বুঝুন ওর মাসিক আয় কত। আমার এতবড় প্রতিদ্বন্দ্বী আর নেই। আর কিছু না হই আমি একজন এম-এ। আর কানাই হচ্ছে ঝুটো বাচস্পতি, পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কোনো এক পরীক্ষা পরিষৎ থেকে উপাধি সংগ্রহ করেছে। অথচ কানাই শুধু যে মোটর কেনবার মত টাকাটা পাচ্ছে তাই নয়, তার নাম আজ গ্রামে গ্রামে। তারপর কানাই আমাকে অকারণে

ঠুক্‌ছে। আমাকে ঠুক্‌ছে, আমার তরুণ ভাইদের ঠুক্‌ছে, আমাদের যা বাণী তাকে খোঁটা দিচ্ছে, খোচা দিচ্ছে। আমরা নাকি এই সনাতন সমাজের মরা গাঙে পাশ্চাত্য সমুদ্রের কর্দ্দমাক্ত জোয়ার আন্‌ছি। আমরা নাকি বাংলার পুরুষকে বিলাসী হতে, বাংলার কুললক্ষ্মীকে কুলটা হতে উদ্দীপনা দিচ্ছি। আরো কত কী! তবে রক্ষা এই যে, কানাই রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত কারুর মুণ্ডপাত কর্‌তে ছাড়্‌ছে না। ও যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলীন্যগর্ব্বী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা। বিংশ শতাব্দীর সমাজের স্কন্ধে ভর করেছে।

ওর ছেলে স্মরজিৎ আমার কাছে ওর নিন্দা করে, ওর জীবদ্দশায় ওর শ্রাদ্ধ করে, এতে আমি বাস্তবিক ভারি খুশি। খুশি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হতো। একবার ভেবে দেখুন কানাই লিখ্‌ছে জামাই ষষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তর বাজে কথা। পরকে আপনার করা, পরের ছেলেকে ঘরের ছেলের চেয়ে সমাদর করা, বাংলার সনাতন বৈশিষ্ট্য, আর্য্যজাতির ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। তার স্থানে স্থানে দেখি গায়ে পড়ে আমাকে দিয়েছে কিলটা চড়টা। কথা নেই বার্ত্তা নেই প্রবন্ধের মাঝখানে আমার নামটা চাপা রেখে (তাও যদি নামটা উল্লেখ করত!) আমাকে নিয়েছে একহাত। "তথাকথিত তরুণ লেখক কেহ কেহ বাঙ্গালীর পরম কল্যাণীয় জামাতা বাবাজীবনকে লইয়া পঙ্ক-হোলি খেলিয়াছেন। নিজের কলুষিত কল্পনার পিচকারীতে ছোপাইয়া স্নেহ-দুর্ব্বলতাময়ী শ্বশ্রূমাতাকে জামাতার নায়িকা করিতে এই কুক্কুরগুলার কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়?"

স্মরজিৎ বাপকে জানিয়েই আমার কাছে আসে, কেয়ার করে না। বলে, "দাদা, আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে সত্য। ওঁর সঙ্গে যেটা সেটা আকস্মিক।" আমি বলি, "তোমার নাম স্মরজিৎ, আমার নাম মহেশ। কী রকম অর্থৈক্য। তুমি বই লিখ্‌লে লোকে ভাব্‌বে

আমিই ছদ্মনাম নিয়েছি।" স্মরজিৎ ইঙ্গিতটা বোঝে না। ওর বাপের মতো ওর বুদ্ধিটা স্থূল। কেন এবং কেমন করে ও বিপক্ষের শিবিরে এসে বিভীষণ হলো, সেইটে আমার আশ্চর্য্য ঠেকে। এমনো হতে পারে যে, ও অপর পক্ষের চর। সরলতার ভাণ করছে। কিন্তু আমি ওকে প্রায় এক বছর কাল পরখ করে দেখ্‌লুম। সত্যিই ওর মনটা সাদা। মনটা সাদা বলে গড়নটা মোটা। চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, নাকটা বোঁচা, হাঁটে থপ থপ করে, ওর সর্ব্বদা বিগলিতভাব। ওর যখন পিঠ চাপড়ে দিই তখন মনে হয় ও যদি পুষি বেড়াল হতো তবে মোলায়েম সুরে ঘড় ঘড় শব্দ করত।

তরুণদের সঙ্গে সাহিত্য চর্চ্চা করতে করতে আমি তাদের যে কয়জনের ব্যথার ব্যথী হতে পেরেছিলুম, স্মরজিৎ তাদের অন্যতম। তারা সুযোগ পেলেই তাদের পারিবারিক কাহিনী আমাকে ভেঙে বলে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পে আমাকে কখনো ঘুম পাইয়ে দেয়, কখনো স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। তাদের প্রেমের উপাখ্যান শুনে যখন আমি বিশ্বাস করি তখন বলি, "এমন ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে, আমি এটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখ্‌ব ঠিক করে রেখেছি।" আর যখন বিশ্বাস করতে পারিনে তখন বলি, "কোন বইতে পড়েছ, বলে ফেল।" কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করবার পরে প্রেমিক পুরুষ স্বীকার করেন যে, সবটা ঘটেনি, কিন্তু এই বলে তর্ক করেন যে, যা ঘট্‌তে পারত তাও ঘটনার সামিল। আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি আর কিছু না পেরে থাকি এটুকু জানতে পেরেছি যে, আমাদের অধিকাংশ তরুণ নিউরোটিক। আমার কাছে যারা আসে তাদের অধিকাংশই বায়োস্কোপ দেখে ও নভেল পড়ে তথাবর্ণিত কাল্পনিক জগৎকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে ও নিজেদেরকে সেই জগতের মানুষ বলে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সত্যি সত্যি

তাই হয়ে যায়। গোলমাল বাধে যখন নভেল না পড়া পাঁচী কিংবা খেঁদি—যাদের ভালো নাম স্বলতা কিংবা আরতি—তাদের অনুরাগ আকর্ষণ করে। অথবা পাশ না হতে পারলে বাবা কঠিন কথা বলেন। অথবা পাশ হলেও মার্চেন্ট অপিসে পর্য্যন্ত আবেদন না-মঞ্জুর হয়। সাহেবের সঙ্গে একবার ইণ্টারভিউ পেলে কি শৈলেশ কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যে নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌বার ছল পেত না? দুটো কোটেশন ও দশটা য়্যালিউশন দিয়ে নিজের বক্তব্যটা বিশদ ও উদ্দেশ্যটা সফল কর্‌ত না?

স্মরজিৎ ঠিক নিউরোটিক না হলেও কালের হাওয়া তাকেও স্পর্শ করেছে। সে আমাকে পিছু ডেকে বলে, "দাদা, আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে সত্যিই চাইনে, কিন্তু একটা খবর না দিয়ে বিদায় নিতেও পারিনে।" আমি অগত্যা চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বসি এবং ঠাকুরকে বলি সবুর কর্‌তে। স্মরজিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, "এগারোটা। কিন্তু এতক্ষণ ওরা সব ছিল, ওদের কাছে কি বলা যায়?"

"কী কথা?"

স্মরজিৎ গৌরচন্দ্রিকা বিস্তার করে। আমি থামিয়ে দিই। আমার কাছে লজ্জা কিসের? আমি তো ওর স্বনামা। আমিও তো তরুণ।

স্মরজিৎ প্রেমে পড়েছে।

এতদিন পড়েনি কেন তার কৈফিয়ৎ দিক্।

কাউকে এতদিন মনে ধরেনি।

মনে মনে বলি, স্মরজিতেরও মনে ধর্‌বার দাবী আছে, যদিও তাকে কারুর মনে ধরা দুর্ঘট। তারপর?

তারপর স্মরজিৎ কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছে, কিন্তু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। এই বলে সে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে। সবগুলিই মুক্ত-বন্ধ। ভাবের তাড়নায় মুক্তকচ্ছ ভাবে ধাবমান।

ব্যাঙ কয়, হে আমার ব্যাঙানি
ঠ্যাং দুটি
প্রতিদিন তোমার গলির পথে
পেণ্ডুলাম সম।
তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

তার স্পর্দ্ধা আমাকেও ঈর্ষ্যান্বিত করলে। আমি এত কিছু পারলুম, কিন্তু কোনো মতে মিল জোটাতে পারিনি বলে কবিতা লিখ্‌তে পারলুম না। স্মরজিৎ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি পড়্‌তে পড়্‌তে তন্ময় হয়ে গেলুম;

তুমি যে উর্ব্বশী নও
নও বিয়াট্রিস
আফ্রডিটি নও
নও হেলেনা যে
তাই তুমি সত্যতর
তাই তুমি আমার
প্রেয়সী।
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

আমি নিজের সবজান্তৃত্ব প্রকট করবার জন্তে জায়গায় জায়গায় বদলে দিলুম। পরিবর্ত্তিত সংস্করণ এইরূপ হলো।

"হে আমার ব্যাঙানি"—ব্যাঙ কয়—
"ঠ্যাং দুটি প্রতিদিন পেণ্ডুলাম সম।"
"কোনখানে?"
"তোমার গলির পথে"—ব্যাঙ
মক মক করে।
"তোমার ঘ্যাঙানি"—ব্যাঙ মুখ ফুটে বলে না—
"কানেই শুনিনি শুধু, শুনেছি প্রাণে।"
তারপর মুখ ফুটে—(বলে)—

"তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে।"

এর পর আমিও কবিতা লেখা ধরলুম। কাগজে যখন দুটি একটি ছাপা হলো কোনো কোনো সমালোচক ওগুলির নাম দিলে "গবিতা" এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা বানালো প্যারডি। এই তো আমি চাই। সুনাম সকলের অদৃষ্টে জোটে না, কিন্তু দুর্ণাম জোটে ক'জনের অদৃষ্টে? আমার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের। আর দুর্ণামে আমার হার হলো কই? কাগজওয়ালারা আমার গল্প আর কবিতা চেয়ে বিনামূল্যে ওদের পত্রিকা পাঠাচ্ছে। দাম দেবে না সেটা জানি। কিন্তু নাম তো হবে।

ইতিমধ্যে স্মরজিতের পায়ের পেণ্ডুলাম সুনলিনীদের পাড়ায় আন্দোলিত হতে হতে আন্দোলন তুলেছে। তাকে একদিন পাকড়াও করে সুনলিনীর বাবা তার বাবার নাম ঠিকানা আদায় করে কানাই বাচস্পতিকে চিঠি লিখেছেন। স্মরজিৎ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপকে ধরা দিচ্ছে না। তবে আমার এখানে হাজিরা দিয়ে যায়, বিমর্ষভাবে

জিজ্ঞাসা করে,—"দাদা, ব্যাঙানির বাড়ী ঠ্যাঙানি খেতে ভয় করিনে। কিন্তু ব্যাঙানিকে না দেখ্‌তে পেলে বাঁচ্‌বো না।"

আমি দায়িত্বহীন প্রেম বরদাস্ত কর্‌তে পারিনে। যে বলে, "বাঁচ্‌বো না", আমি তাকে ক্ষেপিয়ে বলি, "বেশ তো, আমি তোমার শব দাহ কর্‌তে নিয়ে যাবো।" শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, মিথ্যাও বটে। প্রাণ দিয়ে ফেলা কবিতা লেখার মতো সোজা নয়। আমার ব্যাঙানির গোঙানি শুন্‌তে শুন্‌তে আমিই কতবার আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেছি। তারপর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করে ওর শুশ্রূষা কর্‌তে লেগে গেছি।

ওকে বল্‌লুম, "মিতা, আমাকে কবিতা লিখ্‌তে তুমিই প্রবর্ত্তিত কর্‌লে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি একটু মানুষের মতো হও তো আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইস্কুল মাষ্টার নই। তবু স্মরজিৎকে হাতে নিলুম। কানাই বাচস্পতির উপর শোধ তুলতে হবে, স্মরজিৎ আমার অস্ত্র। ওকে বল্‌লুম আমার এইখানেই উঠ্‌তে। তারপর সুনলিনীর বাপের কাছে নিজেই গেলুম ঘটকালি কর্‌তে।

তিনি গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়ে দু'জন ভদ্রলোককে শোনাচ্ছিলেন। আর ডান হাত উঠিয়ে বিচিত্র ভঙ্গী করে টেবলের উপর চাপড় মার্‌ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "আমারই নাম তিনকড়ি, বসুন।"

আমি প্রথমটা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না এই সকাল বেলা গান বাজনার এ আয়োজন কেন। তারপর তিনি নিজেই আমার সংশয় ভঞ্জন কর্‌লেন।

"এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিষ্কার আওয়াজ। কেমন মজবুৎ মেসিন। দাম মোটে দুশো দশ টাকা। আমার কাছে কিন্‌লে দশ পারসেণ্ট কমে পাবেন।" এই বলে আমার দিকেও তাকালেন।

আমি ছাড়া যে দুজন আগন্তুক বসেছিলেন তাঁদের একজন মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বল্‌লেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আমাদের অল্প একটু কাজ ছিল। আগে এঁর পরিচয় দিই। ইনি হলেন পণ্ডিতরাজ কানাই বাচস্পতি।"

তিনকড়িবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এতক্ষণ বলেননি। না জেনে বড় অপরাধ করেছি। ওরে ও ফেলি, পান নিয়ে আয়।" হাত জোড় করে বাচস্পতিকে মস্ত একটা নমস্কার করে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই রইলেন। বাচস্পতি মৃদু হাস্য কর্‌তে থাক্‌লেন। আমিও বাচস্পতিকে অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগলুম। দিব্য বলীবর্দ্দের মত আকার ও আকৃতি। মুণ্ডিত মস্তকে বিল্বপত্রমণ্ডিত শিখা। পায়ে পণ্ডিতী চটি ও গায়ে কোরা চাদর।

বাচস্পতির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সেটি বোধ করি তাঁর আপিসের কেউ হবে। সে বললে, "এই যে—এই—আপনার কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়ে বাচস্পতি মশাই একান্ত বিচলিত হয়েছেন। তিনি দেশকে যে বাণী দিনের পর দিন শুনিয়ে যাচ্ছেন এক কথায় সেটি হচ্ছে এই যে স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। স্বধর্ম্ম কাকে বলি ? না, যা স্বদেশের ধর্ম্ম। আর ধর্ম্মই বা কাকে বলি ? না, যা লোকাচার। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন তার থেকে অনুমান হয় যে, তাঁর নিজের গৃহেই পরধর্ম্ম—ম্লেচ্ছাচার—বিজাতীয় কোর্টশিপ প্রবেশছিদ্র অন্বেষণ কর্‌ছে।"

বাচস্পতি মৃদু হাস্য কর্‌তেই থাক্‌লেন। দেখে মনে হলো না যে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত।

সেই লোকটি নিঃশ্বাস নিয়ে তার বক্তৃতার অনুবৃত্তি কর্‌লে। "বাচস্পতি মশাই স্বনামধন্য সমাজরক্ষী। তিনি আভ্যন্তরিক শত্রুর ভয়ে নিজেকে

অত্যন্ত বিপন্ন মনে কর্‌ছেন। তাঁর মতে এর একমাত্র প্রতীকার পুত্রের মতি পরিবর্ত্তন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মতি তিরস্কার বা সদুপদেশের বাধ্য নয়। অতএব নিতান্ত দায়ে পড়ে তিনি স্থির করেছেন—নিতান্তই নিরুপায় হয়ে তিনি প্রস্তাব কর্‌ছেন যে—”

বাচস্পতি অমনোযোগের ভাণ কর্‌লেন। আমি মনোযোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলুম। গ্রামোফোনের এজেন্ট তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে হাঁ করে সেই লোকটির কথাগুলি গিল্‌তে থাক্‌লেন।

“প্রস্তাবটা বেশী কিছু নয়। বাচস্পতি মশাই যখন বিপত্নীক ও মেয়েটি বিবাহযোগ্য তখন আপনার দিক থেকে আপত্তি না থাক্‌বারই সম্ভাবনা। থাক্‌লে কিন্তু আমরা আপনার উপর পীড়াপীড়ি কর্‌তে অনিচ্ছুক।”

তিনকড়ি বাবু স্তম্ভিত। আমিও তদবস্থ। বাচস্পতি তখনো মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে থাক্‌লেন। আর সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পান হাতে করে ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার কর্‌লে একটি সতেরো আঠারো বছর বয়সের তন্বী। সুন্দরী নয়, কিন্তু সপ্রতিভ। পান দিয়ে এক পাশে চুপ করে দাঁড়ালো তার বাবার আদেশের অপেক্ষায়। তিনকড়িবাবু বোধ করি তার সঙ্গে বাচস্পতিকে মনে মনে মিলিয়ে দেখ্‌ছিলেন। আমিও তাই কর্‌ছিলুম। বাচস্পতির স্বপক্ষে একটি পয়েন্ট তার গায়ের রং ধব্‌ধবে সাদা। সুনলিনীর বিপক্ষে তেমনি একটি পয়েন্ট তার গায়ের রং মলিন শ্যাম। সে গা মেজে আসার সময় পায়নি, পেলে হয়তো মলিনের স্থলে উজ্জ্বল লিখ্‌তে পারতুম।

তিনকড়িবাবু মেয়েকে যাবার অনুমতি দিয়ে বাচস্পতির বান্ধব প্রতিভূকে বল্‌লেন, “এ আমার আশাতীত। কল্পনাতীত। ধারণাতীত। তাই মনঃস্থির কর্‌তে গৃহিণীর সহায়তা লাগ্‌বে। বুঝলেন কিনা এসব তো গ্রামোফোনের ব্যাপার নয়—”

প্রতিভূটিকে অভিজ্ঞ ঘটক বলে মনে হলো। তিনকড়ি দরদস্তুর না করে মেয়ে ছাড়্বেন না। এটা আঁচতে তাঁর দু'মিনিট লাগল না। "বেশ, আপনিও চিন্তা করুন, আমরাও। মহেশ মহলানবীশের সাকরেদ হয়ে ছেলেটা বকেছে। নইলে বাচস্পতিদার এমন কী গরজ।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে সশব্দে—"আমি মশাই, পশুর মতো স্পষ্টবাদী। সারাজীবন গ্রামোফোন চিন্‌লেন, মানুষ চিন্‌লেন না। বাচস্পতিদা'র চরণে চর্ম্ম পাদুকা ও গাত্রে উত্তরীয় দেখেছেন, বাইরে যে তাঁর নিজের কেনা অষ্টিন দাঁড়িয়েচে সেটা দেখেননি। তালতলা গলিতে যে তাঁর নিজের করা দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে সেটা দেখেননি। তাঁর পকেট নেই বলে তিনি যে মাসের পয়লা তারিখে গড়ে তিনশো টাকা কোনখান দিয়ে নিয়ে যান তাও অনুমান কর্‌তে পারেন না। আর ঐ তো আপনার মেয়ে। বয়স পঁচিশের কম হবে না। আর বাচস্পতিদা'র মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স, তার মধ্যে তেরো বছর বিপত্নীক।"

আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়েছিলুম। মহেশ মহলানবীশের কার্টুন কে না দেখেছে? ওরা যে এতক্ষণ চিন্‌তে পারেনি এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে ওরা একটু পরে চিন্‌তে পার্‌বে না।

তিনকড়ি দমে গেলেন। তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, "ৎ-ৎ-তা আমার পাঁচটি নয় সাতটি নয় ঐ একটি মাত্র মেয়ে। এ এ-এইবার আই-এ দেবে। গ-গ-গরীব হলেও আমার যে একেবারে কিছুই নেই তা নয়। সোজাসুজি না বল্‌ছিনে, শুধু কিছু সময় চাইছি, কী নাম আপনার?"

"গিরিজাপতি—"

"গিরিজাপতি বাবু।"

কানাই তার বিরাট বপু নিয়ে উপবেশন সুখ উপভোগ কর্‌ছিল, গিরিজাপতি তাকে ঠেলা দিয়ে বললে, "উঠুন বাচস্পতিদা, উঠুন।

আপনার সময় এত স্বল্পমূল্য নয় যে, চাইলেই দান করে ফেল্‌বেন। কালকের কাগজেই তিনকড়ি বাবুর মেয়ের কোর্টশিপ কাহিনী ছাপা হবে। আর আপনি তো ঘেঁটু পূজার উপর লিখ্‌তে যাচ্ছেন, ওরই এক জায়গায় একটু কলমের খোঁচা—"

বল্‌তে বল্‌তে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠে বস্‌ল। তিনকড়ি বাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, দেখ্‌লেন তো মশাই গুণ্ডামি।"

আমি অসহায় বোধ কর্‌ছিলুম। কানাইয়ের হাতে দৈনিকপত্রের শিলনোড়া। দৈনিক একটা করে তিনকড়ির দাঁত ভাঙবে। তিনকড়ির মামলা কর্‌তেও রাজি হবে না, পাছে পারিবারিক প্রাইভেসী ক্ষুন্ন হয়।

বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "কই মশাই, কনক দাসের এক সেট রেকর্ড দেখালেন না? আমি কখন থেকে বসে রয়েছি।"

তিনকড়ি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, "এই যে" "এই যে" কর্‌তে কর্‌তে রেকর্ডের বাক্স ঘাঁট্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মন ছিল অন্যত্র। বোধ হয় অন্দরে, গৃহিণীর আঁচলে। আমি দয়া করে উঠ্‌লুম। বল্‌লুম, "থাক মশাই, অর্ডার দেওয়া রইল। ঠিকানাও দিয়ে যাই। সময় মতো পাঠিয়ে দেবেন।"

আমার কার্ড পড়ে তিনকড়িবাবু দাঁত বার করে হাস্‌লেন।—"কী সৌভাগ্য, সুনলিনী আপনাকে কতবার দেখ্‌তে চেয়েছে। আপনার সমস্ত বই ওকে কিনে দিতে হয়েছে। একটু অনুগ্রহ করে বস্‌তে আজ্ঞা করেন তো ওকে বলি চা করে আন্‌তে।"

আমি ঘাড় নাড়লুম। অন্য একদিন আস্‌ব। এ পাড়া ও পাড়া।

স্মরজিৎকে ডাক দিলুম। সে রাশি রাশি "মুক্তকচ্ছ" লিখে বিরহ উদ্‌যাপন কর্‌ছিল। আমার ডাক শুনে খাতাশুদ্ধ উপস্থিত হলো। আমি

টান মেরে বল্লুম, "ওসব রাবিশ রাখো। কাজের সময় কাজ, লেখার সময় লেখা।"

ও খুব ভয় পেলে। আমি একটু নরম হয়ে বল্লুম, "তোমার বাবা স্থনলিনীকে বিয়ে কর্বেন বলে ক্ষেপেছেন। এ বিয়ে বন্ধ করা চাই-ই।" আমি জান্তুম তিনকড়ি ছ'দিন পরে বাচস্পতির পায়ে না ধরে পার পাবে না।

স্মরজিতের মুখ শুকিয়ে গেল। তার চোখে জল দেখা দিলে। তার হাত থেকে কবিতার খাতা মেজেতে পড়ে হাওয়ায় উড়্‌ল। সে একবার বললে, "ও হো হো।" তারপর বল্‌লে "আমি বাঁচ্‌ব না।"

আমি ধমক দিয়ে বল্লুম, "আলবৎ বাঁচ্‌বে। ও মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে হবে তোমাকেই।"

স্মরজিৎ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বললে, "ক্ষমা করুন দাদা। বাবা যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সে আমার মা। মাতৃগমন মহাপাপ।"

আমি দেখ্‌লুম রাগ করাটা এ ক্ষেত্রে ভুল পলিসি। তা হলে স্মরজিৎ হাতছাড়া হবে। কানাই জিতে যাবে।

আমি স্মরজিতের মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লুম, "সে-ই বীর যে ঠিক সময়ে ঠিক কর্ত্তব্যটি করে। সে-ই পুরুষ যে নারীকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে ইতস্তত করে না, অন্যায়কারী যেই হোক।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কি একদিনের কাজ? হপ্তাখানেক পরে স্মরজিৎকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে, সে স্থনলিনীকে যেমন করেই হোক বিয়ে কর্‌বে। ওদিকে কানাই তিনকড়িকে নিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলেছে। আমার কাছে কন্যা পক্ষের একখানা নিমন্ত্রণ পত্রও এসেছে। কানাই যে খুব ধূমধাম করে বৌ আন্‌তে যাবে এ গুজব আমি তার আপিস থেকে আনিয়ে নিয়েছি। বিনাপণে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে সে।

বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ পেয়ে এজন্যে তাকে অভিনন্দন করে এক প্যারা-গ্রাফ ইতিমধ্যেই তার কাগজে বেরিয়েছে।

আমারও রোখ চেপেছে কিছুতেই এ বিয়ে আমি হতে দেবো না। আমার ভক্ত পাঠিকা কানাইয়ের হাতে পড়ে আমার নিন্দা শুনতে থাকবে? অসম্ভব! এ কালের কলেজে পড়া মেয়ে একটা "রাজভাষা" পড়ে ইংরাজী শেখা ছাত্রবৃত্তি পাশ টিকিওয়ালার ঘর করবে? অসম্ভব! যেখানে বয়সের সামঞ্জস্য নেই, শিক্ষার সামঞ্জস্য নেই, রুচির সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সুখেরও আশা লেশমাত্র থাকতে পারে না।

বিয়ের দিন স্মরজিৎকে ডেকে চুপি চুপি বললুম, "রাঁধুনি বামুন সেজে সুনলিনীর বাড়ী বহাল হতে হবে। ওর বাবা তোমাকে বাবু-বেশে দেখেছেন, খালি-গায়ে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেন না। ওদের বাড়ীতে কাল বিয়ের হৈ চৈ, কে কার খোঁজ রাখে। এক সময় সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বোলো সাড়ে ন'টায় আমি মোটর নিয়ে গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করব। তোমরা এলে তোমাদের এখানে এনে সেই রাত্রেই বিয়ে দেবো।"

রাঁধুনি বামুন সাজ্‌তে ওর লজ্জা, সুনলিনীর সঙ্গে দেখা করতে ওর শঙ্কা এবং সুনলিনীকে বিয়ে করতে ওর বাসনা, এই তে-টানায় পড়ে ও কেমন হয়ে গেল। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। ন যযৌ ন তস্থৌ। আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, "কী হে, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে। ঐ সাহসের একটি কণা দেখালে বিয়েও করবে, শ্বশুরের গ্রামোফোনের টাকাও পাবে, হয় তো মাঝারি লেখকও হয়ে দাঁড়াতে পারো।"

ওকে তালিম দিলুম। ওর নাম ক্ষেত্রমোহন। ওর বাড়ী পুরুলিয়া। কলকাতায় নতুন এসেছে কাজ খুঁজ্‌তে। কে ওকে বলেছে এ

বাড়ীতে বিয়ে। ওর রান্নার নমুনা দেখুন। শ্রীযুক্ত মহেশ মহলানবীশ ওর রান্নার প্রশংসা করে ওকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন।

ওকে কয়েকটা রান্নাও শিখিয়ে দিতে হলো। কানাইয়ের চিরদিন এই সমৃদ্ধি ছিল না। কানাই যখন ভিক্ষা করে খেতো তখন স্মরজিৎকেই রান্না কর্‌তে হতো। সে সব সে একেবারে ভুলে যায়নি, তবে ভোল্‌বার ভাণ কর্‌ছে। তাই আমিও শেখাবার ভাণ কর্‌লুম।

বলিদানের পাঁঠার মতো চম্‌কে চম্‌কে ওঠে, একবার এগোয়, একবার থম্‌কে দাঁড়ায়, একবার ফেরে। ওকে তিনকড়িবাবুর গলির মাথায় পৌঁছে দিয়ে আমি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলুম।

ওর উপর আমার ভরসা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত ও হয়তো তিনকড়ির তিন তাড়া খেয়ে পিটটান দেবে। তিনকড়ি ওকে চিনে ফেল্‌তেও পারেন। গেলুম আমার এক পুলিশ বন্ধুর কাছে। খুলেই বল্‌লুম। না বললেও চল্‌ত। কেননা কানাইয়ের কাগজ ওকেও ঠুকেছে, ওর রাগ আছে কাগজের কর্ত্তাদের উপর। ও বললে, "কিছু কর্‌তে হবে না। কানাইকে আমি চিনি। অমন ভীতু লোক ভূ-ভারতে নেই। আমি ওর আপিসে ফোন করে জানাচ্ছি, খবর পাওয়া গেছে ওর লেখা পড়ে মুসলমানেরা ক্ষেপেছে। ও যেন এক্ষুণি কলকাতা ছাড়ে।"

শুধু ওইটুকুতে কি ফল হবে? আমার সংশয় গেল না। কিন্তু তারিণী বললে, "ফলেন পরিচীয়তে। তুমি সবুর করে দেখ, এ ঠিক মেওয়া ফলবে।"

গলিতে ঢুকে শুন্‌তে পেলুম একজন আরেক জনকে বল্‌ছে, "আবার বাধ্‌ল।"

"কী বাধ্‌ল, মশাই?"

"হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। শোনেননি কানাই বাচস্পতির ভুঁড়িটা ফাঁসিয়েছে?"

আমি পুলকে শিউরে উঠ্‌লুম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী রেখে হর্ণ বাজালুম। স্মরজিৎ ও তার বধূ আসে না। বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লুম দক্ষ যজ্ঞের মতো ব্যাপার। পাড়ার অর্দ্ধেক খালি হয়ে গেছে, কল্‌কাতা ছেড়ে উধাও। বাড়ীর চাকর-বাকরেরাও বল্‌ছে, "আমাদের ছেড়ে দিন, কর্ত্তা। আমরা পালিয়ে বাঁচি।" ভিতর থেকে মহিলাদের কান্নার রোল কানে আস্‌ছে। আর আমাদের স্মরজিৎ রাঁধুনি বামুনের বেশে পেণ্ডুলামের মতো একটি রেখা ধরে একবার অন্দরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, একবার সভার দিকে ছুটে আস্‌ছে। আমি তার গতিরোধ করে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, "কী ঠাকুর, কী হয়েছে?"

সে কেঁদে ফেলে বললে, "দাদা, গুজবটা কি সত্যি? বাবাকে ওরা জবাই করেছে?"

তাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে নির্ম্মমভাবে বল্‌লুম, "Mind your own business. নিজের কাজ কতদূর?"

এখনো সে সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি। অকর্ম্মণ্য। কল্‌কাতা ছাড়বার জন্যে নিশ্চয় সুনলিনী ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এই তো সুযোগ। তাকে তাড়া দিলুম, "যাও, দেখা করে বলো তুমি ওকে উদ্ধার করতে এসেছ।"

সে কি শোনে? শুধু বলে, "হায় হায় বাবা।"

আমি প্যারডি করে বল্‌লুল, "হায় হায় হাবা!" তারপর তাকে ধরে নিয়ে আমার গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলুম। সে যেন আমার বাড়ী গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে। তার বাবার খবর নিতে যেন নিজেদের বাড়ীতে যায় না। সেটা গুণ্ডারা ঘেরাও করেছে।

"এই যে শ্রীযুক্ত মহলানবীশ", তিনকড়ি বাবু উন্মাদের মতো বললেন, "ওসব বিশ্বাস কর্‌বেন না, বুঝ্‌লেন। মাথার উপর ভগবান থাক্‌তে এ কি কখনো হতে পারে? আমার দশাটা একবার ভেবে দেখা তো ভগবানের উচিত?"

আমি মনে মনে বললুম, ভগবানকে যত বড় ভাবুক লোকে মনে করে তিনি তত বড় নন। মহেশ তাঁর উপর খোদকারী কর্‌বে। দেবেই আজ রাত্রে স্মরজিতের বিয়ে।

খবর নিতে তিনকড়ি যাকে পাঠিয়েছিলেন সে এসে পড়ল। বললে, "বাচস্পতি মশাই গুম হয়েছেন।"

তিনকড়ি কপালে চাপড় মেরে ডাক ছাড়্‌লেন, "হা ভগবান, গুণ্ডার হাতে গৈবী খুন।"

ভিতরে বামাকণ্ঠের সানাই বেজে উঠল।

দাঙ্গা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যে ক'জন বাকী ছিল তারাও সরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। পাড়ার ছোকরাদের উপর এতদিন তিরস্কার বর্ষণ হচ্ছিল তারা নিষ্কর্মা বলে। এখন তারাই হলো পাড়ার ভরসা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকগুলি হকি ষ্টিক্ ক্রিকেট ব্যাট টেনিস র‍্যাকেট বারবেলের ডাণ্ডা কাঠের মুগুর নির্গত হলো।

বাপ মর্‌লে ছেলের বিয়ে সেই রাত্রে হতে পারে না। আমার শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি তিনকড়ির বাড়ী থেকে তারিণীকে ফোন কর্‌লুম। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে কানাইয়ের খুনের গুজব রটেছে। কে জানে এই অবলম্বন করে শেষ কালে একটা সত্যিকার দাঙ্গা বেধে বস্‌বে। তারিণীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ল। বললে, আস্‌ছে।

ইতিমধ্যে সকলে তিনকড়িকে ধরাধরি করে একখানা তক্তপোষের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। পুলিশের লোক দেখে তাঁর চেতনা ফিরল।

তারিণী বললে, "তিনকড়িবাবু, আপনি বিবেচক ব্যক্তি। পুলিশের কাছে খবরটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে চট করে বিশ্বাস করে ফেললেন যে, বাচস্পতি মশাই খুন ?"

"শুন্‌লুম তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

"অদৃশ্য হয়তো তিনি স্ব-ইচ্ছায় হয়েছেন। অমন একটা গুজব শুন্‌লে কে না অদৃশ্য হয়ে যায় ?"

এইবার আমার পালা। তিনকড়ি ও তাঁর দাদা রাখোহরি বাবু আমাকেই মুরুব্বি পাকড়ালেন। "শ্রীযুক্ত মহলানবীশ, বিবাহ তো স্থগিত থাকৃতে পারে না।"

"তা তো পারেই না।" আমি এতক্ষণ মনে মনে মহলা দিচ্ছিলুম, মহলানবীশের মহলা। বললুম, "হয় আজ রাত্রেই বাচস্পতি মশাইকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে, নয় পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে হবে।" তিনকড়ি ও রাখোহরি মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌লেন। হয়তো ভাব্‌লেন মহলানবীশ নিজেই কেন বরের পিঁড়িতে বসে যান না ? কানাইয়েরই সমবয়সী, তফাতের মধ্যে আছে এক চির শয্যাগতা স্ত্রী। না থাকারই সামিল।

আমি প্রলোভন দমন কর্‌লুম। সুস্থকায়া স্ত্রী পেলে আমি তো আর অবচেতন মনের মনীষী রইব না, আমার পেশা যাবে, বাংলার সাহিত্য আমার বিশিষ্ট দান থেকে বঞ্চিত হবে।

বললুম, "দেখুন, বাচস্পতিকে আজ রাত্রে কলকাতায় পাবেন না। প্রাণ আগে, না পরিণয় আগে ? তা বলে বাচস্পতি ছাড়া কি পাত্র মেলে না ? এই তো বাচস্পতিরই ছেলে স্মরজিৎ রয়েছে—"

তিনকড়ি কথা কেড়ে নিয়ে ভারি উষ্মার সহিত বললেন, "সেই হতভাগাটার জন্যেই তো এই বিপদ। দুবেলা সামনের গলিতে ঘুর ঘুর

কর্‌ত। ফেলির পড়াশুনায় মন বস্‌ত না, তাই জানিয়েছিলুম বাচস্পতি মশাইকে। কী কুক্ষণেই জানিয়েছিলুম। শ্রীযুক্ত মহলানবীশ তো স্বচক্ষে দেখেছেন সে কী জুলুম।"

"ও কথা ভুলে যান তিনকড়ি বাবু।" আমি প্রবোধ দিয়ে বল্‌লুম। "উপস্থিত বিবেচনা করুন আজকের এই অর্দ্ধেক খালি কল্‌কাতা শহরে স্মরজিৎকে মেয়ে দেবেন কি অন্য কাউকে খুঁজ্‌তে বেরোবেন। স্মরজিৎ বি-এ পাশ, এইবার ল দেবে। আপনার মতো মুরুব্বি আর আমার মতো হিতৈষী পেলে ও যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাসবিহারী কি তৃতীয় আশুতোষ হবে না কে একথা জোর করে বল্‌বে। যৌবনকালে কত মহাপুরুষ কত কীর্ত্তি করেছেন। ও তো শুধু নিজের পায়ের জুতো খইয়ে আপনার বাড়ীর সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে।"

তিনি একবার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বহুবিধ কাতরোক্তি কর্‌তে কর্‌তে বললেন, "সেই মেয়ে পাগ্‌লাকেই মেয়ে দেবো। এখন তাঁকে পাই কোথায় ?"

সে ভার আমিই নিলুম। গেলুম স্মরজিৎকে আন্‌তে। ভগবানের চেয়েও বড় ভাবুক আছে। সে মহেশ। সেই মহলানবীশের মহলা বিধির বিধানকে পরাজিত করে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌তে পারে সেই মহলান্‌বীশ।

কিন্তু কোথায় স্মরজিৎ ? রয়েছে একখানা চিঠি।—"দাদা, পিতার ঈপ্সিতাকে পত্নী কর্‌তে পার্‌ব না। আমার মরণ শ্রেয়। চল্‌লুম মরণের সন্ধানে। ইতি। অভাগা স্মরজিৎ।"

এইখানে গল্পটি শেষ করে দিলে পাঠক হয়তো স্মরজিতের মরণে অশ্রুপাত কর্‌বেন। সেটা অনর্থক। স্মরজিৎ দিব্যি বেঁচে আছে, তবে আমি ও আমার নবীনা স্ত্রী তার মুখদর্শন করিনে।

উপযাচিকা

বাবা লিখেছিলেন সন্ধ্যার গাড়ীতে আস্‌ছেন। তাড়াতাড়িতে বাংলোটাকে নৈষ্ঠিক হিন্দুর আবাস করে তুল্‌তে আমার মতো একা মানুষের সামান্য পরিশ্রম হয়নি। অবশেষে ষ্টেশনে গিয়ে দেখ্‌লুম তিনি আসেননি। ভাব্‌লুম হয়তো ট্রেন মিস্‌ করেছেন, ভোরের গাড়ীতে আস্‌বেন। তাঁর জন্যে হিন্দুর দোকানের খাবার আনিয়ে রেখেছিলুম, তুলে রাখ্‌লুম, যদিচ জিনিসগুলির উপর আমার নিজের বৈলাতিক বিরাগ ছিল না মোটেই।

ভোরের গাড়ীর জন্যে রাত থাকৃতে উঠ্‌তে হয়। অতটা পিতৃভক্তি আমার মতো ঘুমকাতুরে লোকের শরীরে সয় না। পাঠালুম আমার চাপরাশীকে। বাবার নামটা পঞ্চাশবার মুখস্থ করালুম, চেহারাটাও বাক্য দিয়ে এঁকে কান ধরে দেখালুম। "রবিনাশ বাবু নয়, অবিনাশ বাবু। মনে থাকৃল ?" "জী হুজুর।"

একটু বেলা করে ঘুম ভাঙ্‌ল। বাবা না জানি কী মনে করৃছেন। লাফ দিয়ে উঠে দেখি—কোথায় বাবা ?

চাপরাশী একটা সেলাম ঠুকে এক গাল হেসে বললে, "হুজুর এসেছেন।"

দেখ্‌তে না পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় তিনি ?"

"ওই যে, ঐ গাছতলায় বিড়ি খাচ্ছেন।"

কী ! আমার সাত্বিক নিরামিষাশী বাবা বুড়ো বয়সে বিড়ি খাচ্ছেন ! দেখ্‌লুম কে একটি ছোকরা গাছের দিকে মুখ করে লুকিয়ে বিড়ি টানৃছে।

"হতভাগা! কী নাম ধরে ডেকেছিলি? ওর কী আমার বাবার বয়স?"

"হুজুর, রবিবাবু রবিবাবু বলে কত ডাক্‌লুম। কেউ সাড়া না দিলে আমি কী কর্‌ব? ইনি সুধালেন বোস্ সাহেবের কুঠি জানো, সর্দার? আমি ঠাওরালেম ইনি হুজুরের—"

"চোপ রও, শূয়ার।

চাপ্‌রাশী দু পা পিছিয়ে গিয়ে দুই হাত জুড়্‌ল।

গাছতলার ছোকরাটি সাহেবী গলা শুনে চম্‌কে উঠে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। চুরি করে দেখ্‌লে সাহেব স্বয়ং। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললে, "গুড্ মর্ণিং, সার। চিন্‌তে পার্‌ছেন?"

গালে ও গলায় মাংস নেই, মাথায় প্রচণ্ড টেরি, সিঁথির গোড়াতে এক মণ্ডল। কাঁচা বাঁশের মতো লম্বা লক্‌লকে গড়ন। মাজা দুর্বল। আমি যতক্ষণ ভাব্‌তে থাক্‌লুম, কে এ, সে ততক্ষণ ময়লা দাঁত বের করে হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু ভরসা পেলে না।

"আরে এ যে বৃন্দাবন।" আমি সোল্লাসে বললুম, "বৃন্দাবন না?"

"মনে আছে দেখ্‌ছি।"

"বৃন্দাবন, বিন্দে, তুই হঠাৎ কোত্থেকে এলি? আয়, আয়।"

বৃন্দাবন আমাকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বল্‌বে কি না ঠিক্ কর্‌তে না পেরে ঘুরিয়ে বললে, "এই বাংলোতে থাকা হয়?"

"হ্যাঁ! এটা আবার একটা বাংলো! দেখছিস্ তো এতে না আছে লাইট্ না আছে ফ্যান। তুই হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে, বৃন্দাবন। আগে কিছু খেয়ে তারপর অন্য কথা।"

বৃন্দাবন। বিন্দে। আমার আশৈশব বন্ধু। থার্ড ক্লাস থেকে

বিদায় নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে শুনলুম সে রেলের কন্‌ট্রাক্টর হয়ে দিব্য রোজগার করছে। আমি পড়ি কলেজে, হাতে একটি পয়সা থাকে না, বৃত্তি যা পাই তাতে পেট ভরে খাওয়াই হয় না। আর বৃন্দাবন দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছে। বড়, মেজ, সেজ ও ছোট সাহেবদের ঘুষই খাওয়াচ্ছে কত!

তারপর চাকা ঘুরেছে। এই সেই বৃন্দাবন ও এই সেই ললিত।

রাত্রের তুলে রাখা সন্দেশ রসগোল্লা সহযোগে ছোটা হাজরি খেয়ে বৃন্দাবন যেন বাল্যকালে ফিরে গেল। কখন এক সময় 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ও 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' ধরলে। বললে, "বেড়ে আছিস্ তুই লল্‌তে। তোদেরই, ভাই, সার্থক জীবন। মাইনে পাস্ আড়াই শো—"

"আড়াই শো তো নেটিভদের মাইনে। আমার মাইনে হলো সাড়ে তিন শো।"

"সা—ড়ে—তি—ন—শো টাকা! সুরুতেই এই। উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত উঁচুতে উঠ্‌বি কে জানে। তারপরে পাবি পেন্‌সন। নিশ্চয়ই কিছু উপরি পাওনাও আছে।" এই বলে সে এক চোখ বুঁজে জিভ কাট্‌লে।

আমি চুপ করে থাক্‌লুম।

সে বক্ বক্ কর্‌তে কর্‌তে প্রশ্রয় পেয়ে বলে বস্‌ল, "বিয়ে করিস্‌নি, তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। কেন বল্ দেখি। বিলেত থেকে একটি আন্‌তে পার্‌লিনে?"

আমি ওর চেয়ে ভদ্র ভাষার প্রশ্ন আশা করিনি। রেলের কন্‌ট্রাক্টর আর কত ভদ্র হবে। হাসির রেখা টেনে বললুম, "বিলিতী মেমসাহেব তোকে এমন করে অভ্যর্থনা কর্‌তেন বলে তোর বিশ্বাস হয়?"

বৃন্দাবন ভড়্‌কে গেল। বললে, "দেখিস্ ভাই, কক্ষণো মেম বিয়ে

করিস্‌নে, যদি আত্মীয় বন্ধুর প্রতি তোর বিন্দুমাত্র মমতা থাকে। (লক্ষ্য করে) সিগার? কী নাম? 'Corona'? দেখ্‌ব একটা মুখে দিয়ে?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

বৃন্দাবন কাশ্‌তে কাশ্‌তে বললে, "আমরা অবশ্য বিলেত-ফেরৎ নই। তবু খাস বিলিতী না হোক্ এদেশী—যাকে বলে ফিরিঙ্গী—মেম আমরাও··· (খক্ খক্) ···আমরাও···। আচ্ছা, তুই ওদেশে লব্ করেছিস্?"

আমি রঙ্গ করে বললুম, "বিয়ে কর্‌তে বারণ কর্‌লি, বিয়ে না কর্‌লে love করি কেমন করে? বিয়ের পরেই না love?"

"না রে," বৃন্দাবন সিগার খেতে গিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে কাবু হয়ে বললে, "অমন লবের কথা বলিনি। ও তো স্বর্গীয় প্রেম। হিন্দু সতী ছাড়া কার কাছে ও প্রেম পাবি? একটি ভালো দেখে বিয়ে কর্। দেরি কর্‌ছিস্ কেন? বলিস্ তো আমি পাত্রীর খোঁজ করি।"

"না," আমি তার আন্তরিকতা লক্ষ্য করে গম্ভীর মুখে তামাসা কর্‌লুম। "ও সব পাত্রীটাত্রী আমার পোষাবে না। বিয়ে কর্‌লেই ধাত্রীর দরকার হবে। ছেলে এলেই রূপ যৌবন যাবে।"

বৃন্দাবন সিগার সরিয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে বললে, "তবে?"

"তবে?" আমি একটু ইতস্তত করে বললুম, "তখন সেই তো রক্ষিতা রাখ্‌তে হবে, এখন থেকে রাখ্‌লে দোষ কী?"

সে কী মনে করে হেসে ফেললে। বললে, "যাঃ!"

"সত্যি।"

"যাঃ।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? কেন, এতে নূতনত্ব কী আছে?"

"রামঃ রামঃ রামঃ। অবিনাশ কাকার ছেলে না তুই? কমার্স পাশ করেছিস্ না?" সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

সগর্ব্বে বললে, "লব্ আমরাও করেছি। তা সে খাস বিলিতী মেমের সঙ্গে নাই হোক্। বিশ্বাস হচ্ছে না, কেমন? কী করে হবে? আমরা তো বিলেতও যাইনি, পাস্ করিনি। কিন্তু বলুক দেখি কেউ যে আমি পিতৃপিতামহের পিণ্ডদানের জন্যে, সনাতন হিন্দু কায়স্থের কুলরক্ষার জন্যে, কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারের জন্যে, বিবাহ কর্‌তে পশ্চাৎপদ হয়েছি। আরে, একটা কেন, দশটা বিয়ে করব। আমি যে পুরুষ।" এই বলে সে তার শীর্ণ গুম্ফরেখায় আঙুল বুলিয়ে দিলে, পাক দিতেও চেষ্টা কর্‌লে।

সেই পুরুষোত্তমের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করি? বললুম, "এই যাঃ। তোর বিয়ে হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গেছি।"

"ভুলে যাবিই তো। আমরা তো অফিসার নই, আমরা কেরাণী।"

"কেন রে? তুই না আসানসোলে কনট্রাক্টরি কর্‌ছিলি?"

"ঐ কনট্রাক্টরিই আমার কাল হলো। তুই বিশ্বাস কর্‌বিনে, ললিত, একটার সঙ্গে লব্ হলে এক পাল এসে ঘেরাও করে। সবাইকে উপহার দিতে দিতে দেনা দাঁড়িয়ে গেল কত! তারপর সেই বিশ্রী রোগ—"

আমি আঁৎকে উঠ্‌লুম। এই লোকের সঙ্গে এক টেব্‌লে খাচ্ছি।

"সেই বিশ্রী রোগে একটি বছর ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গেলুম। দেখ্ না, কেমন হাড় ফুটে বেরোচ্ছে। কিছুতে কিছু হলো না। অবশেষে—"

আমি হাঁফ ছেড়ে বললুম, "সেরেছে তা হলে?"

"সার্‌বে না আবার?" বৃন্দাবন একগাল হেসে বললে। অবশ্য তার গাল বলে কোনো পদার্থ ছিল না। "সার্‌বে না তো হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা। ভুজঙ্গেশ্বর শিবের নাম শুনেছিস্?"

"না।"

"ওসব তোদের মতো সাহেব সুবোর না শোন্‌বারই কথা। তবে বড় বড় ফিরিঙ্গী সাহেব টম্মি সাহেবও বাবা ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে মানৎ রেখে কৃপা পেয়েছে। যাক্‌, সেই ভুজঙ্গেশ্বরের পায়ে হত্যে দিয়ে পড়্‌লুম। 'তুই আমায় না বাঁচালে কে বাঁচাবে বাবা? বাঁচিয়ে দে, বাবা, বাঁচিয়ে দে।' সাত দিনের দিন বাবা মুখ তুলে চাইলেন। স্বপ্ন দিলেন, 'যা তুই বিয়ে কর্‌ একটি লক্ষ্মী মেয়ে দেখে। নিজের স্ত্রীর সহবাসে আপনি সেরে যাবে'।"

আমি হাস্‌ব কি রাগ কর্‌ব ঠিক্‌ কর্‌তে না পেরে চোখে জল এনে ফেলেছিলুম। কোন লক্ষ্মী মেয়ের জীবন ব্যর্থ কর্‌লে এ মূঢ়।

বৃন্দাবন দর্পভরে বললে, "হিন্দু ধর্ম্মের কিবা মহিমা। বিয়ে কর্‌লুম বারো বছর বয়সের অনাঘ্রাত কুসুম। আর দেখ্‌তে না দেখ্‌তে রোগ গেল ছেড়ে; শ্রীবৎস রাজার শরীর থেকে যেন শনি বেরিয়ে গেল।"

"কিন্তু," আমি বললুম, "তোর শরীর থেকে গিয়ে তিনি তোর স্ত্রীর শরীর আশ্রয় কর্‌লেন কি না সংবাদ নিয়েছিস্‌?"

বৃন্দাবন টেবল্‌ থেকে ন্যাপকিন্‌টা তুলে নিয়ে চোখ মুছ্‌ল। ধরা গলায় বললে, "সতী লক্ষ্মী এয়ো রাণী। তাঁর আয়ু ফুরিয়েছিল। তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ কর্‌লেন।"

আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, "তারপর তুই বোধ করি আরেকটি নবীন বস্ত্র সংগ্রহ কর্‌লি?"

"সংগ্রহ কর্‌তে হয় না রে। আপনি এসে পড়ে। ভদ্রলোকের বয়ঃস্থা মেয়ে। বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। মা বললেন, উদ্ধার কর। আমিও দেখ্‌লুম যে বিয়ে না কর্‌লে আবার খারাপ হয়ে যাবো।"

বাল্য সুহৃৎকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলুম। আমার এমন হাসি

পাচ্ছিল যে তার একটা নিষ্কাসনের উপায় না করলে হয়তো ঘরে বসে অপঘাতে মরতুম।

"ছাখ্ বৃন্দাবন," আমি ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়লুম। "দেখ্লি তো আমার বাবুর্চিকে। না দিশী না বিলিতী কোনো রান্না শুদ্ধভাবে জানে না। এদেশে যাকে সাহবী খানা বলে আমি, ভাই, ও জিনিস বরদাস্ত করতে পারিনে। ওর চেয়ে পুরোপুরি দিশী খাবার ভালো।"

"তা হলে," বৃন্দাবন প্রস্তাব করলে, "একটি ঠাকুর রাখ্তে পারিস্।"

"ঠাকুর? না, ঠাকুর নয়। একটি ঠাকুরাণী পেলে রাখি।"

বৃন্দাবন থমকে দাঁড়ালো। "কী? কী পেলে রাখ্বি?"

"পাচিকা।"

"যাঃ!"

"কেন রে?"

"যাঃ। ঠাট্টা করছিস্।

"সত্যি বলছি। যার হাতে খেয়ে বেশ একটি সুমধুর পরিতৃপ্তি হবে, যে আমাকে অন্নের সঙ্গে অমৃত পরিবেশন করবে, সে নিশ্চয়ই মেসের বামুন নয়। উঃ সে কী দুর্ভোগ!"

"তবু," বৃন্দাবন বললে, "যাঃ।"

আমি বললুম, "যাই বল্, একটি সুন্দরী সুনবীনা পাচিকা পেলে আমি বোখারা ও সমরকন্দ দিয়ে দিতে রাজি আছি। চাইকি একশো টাকা মাইনে।"

"এ-ক-শো টাকা! মাইরি?"

"কেন এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে?"

"না! কিছুমাত্র নেই! যখন আমার নিজের মাইনে হচ্ছে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।"

আমি লজ্জিত হলুম। কিন্তু থার্ড ক্লাস অবধি যার দৌড় তার উপর মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ আছে বল্‌তে হবে।

বৃন্দাবন বললে, "শুধু পাচিকা হলে চল্‌বে না, সুন্দরী ও সু—সু—"

"সুনবীনা।"

"সুনবীনা হওয়া চাই ?"

"তা নইলে খাওয়ার মতো একটা মামুলি ব্যাপার এস্‌থেটিক্‌ আনন্দে ভরপুর হবে কেন ?"

"বুঝেছি।"

আমি ভাব্‌লুম বৃন্দাবন এস্‌থেটিক্‌ কথাটার মানে বুঝেছে। তা নয়।

"বুঝেছি তোর অভিসন্ধি।" বৃন্দাবন রহস্যের হাসি হাস্‌ল।

যাক্‌, কষ্ট করে বোঝাতে হলো না। বললুম, "আছে অমন কোনো মেয়ে তোর জানাশুনা ?"

"নেই আবার !" বৃন্দাবন বললে আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে।

"তবে," আমি ভারি অধৈর্য্য হয়ে বললুম, "তুই কল্‌কাতা গিয়েই ওকে পাঠিয়ে দিস্‌ এখানে। খাওয়াদাওয়ার অকথ্য অসুবিধে হচ্ছে।"

"বুঝেছি।" সে দুষ্টু হাসি হাস্‌ল। বললে, "ভেবেছিলুম বিলেতের কমার্স পাস যখন তখন লোকটা সচ্চরিত্র।"

"কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোকটা সুবিধাবাদী।"

আমরা একটা বাঁধা বটতলায় বিশ্রাম করলুম।

বৃন্দাবন আরম্ভ করলে, "একটি মেয়েকে জানি, নাম তার সুবর্ণ। যেমন নাম তেমনি রূপ। দেবী প্রতিমার মতো দ্যুতি। চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়।"

"কুমারী না বিধবা ?"

"সধবা।"

আমি সত্যি সত্যি নিরাশ হলুম। বললুম, "তা হলে থাক্।"

"শোন্ আগে সবটা। সধবা বটে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সংসর্গ নেই। ঐ যাঃ, তোকে আবার ভয় পাইয়ে দিতে হচ্ছে। স্বামীর কুৎসিত রোগ।"

আমি বিবর্ণ মুখ বিকৃত করলুম। বৃন্দাবন ফূর্তি করে বললে, "সে বড় মজার। গেছ্ল সে ঢাকায় না চাটগাঁয়। নিয়ে এলো হাতে পায়ে ফোস্কা। বললে, ষ্টীমারের বয়লারের ছোঁয়া লেগে অমন হয়েছে। স্বর্ণ বিশ্বাস করলে। তখন তার বয়স কতই বা—বোধ হয় বারো কি তেরো। এমন সেবা করল যে সেবা যাকে বলে। কিন্তু এত সেবা সত্ত্বেও বয়লারের ফোস্কা সারে না। ক্রমে ক্রমে সারা শরীর ফোস্কায় ছেয়ে যায়। হরিপদ কলকাতা শহরের ষোলোখানা বাড়ীর মালিক। চিকিৎসাটা যা করালে তা আমার মতো কণ্ট্রাক্টরের সাধ্যের বাইরে। কেউ ওকে ভুজঙ্গেশ্বরের পরামর্শ দেয়নি, তাই স্ত্রীকে ও সযত্নে দূরে রেখেছে। স্পর্শ করেনি। এমন মূর্খ।"

আমি মনে মনে বললুম, "ধন্য।"

"স্ত্রীর যখন ভোগের বয়স পূর্ণ হলো স্বামীকে অক্ষম দেখে তার ক্রমশ ঘেন্না ধরে গেল। সেবা তো বড় কম করেনি। এত সেবার পুরস্কার কী হলো? কতগুলো নাটক নভেল পড়ে এই হলো তার প্রশ্ন। সে এক দিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হারিয়ে গেল।"

আমি বললুম, "নাটক নভেল পড়ার পরিণাম!"

"তা নয় তো কী।" বৃন্দাবন উত্তেজনার সহিত বললে, "ঘরে ঘরে মেয়েরা তবে বকছে কেন? আমি তো স্ত্রীর হাতে দেবার মতো বই একখানাও দেখ্লুম না। এমন কি স্ত্রীলোকের লেখা বইও না।"

"তুই এক কাজ কর্।" আমি প্রস্তাব করলুম, "স্ত্রী নয় পুরুষ নয় এমন কোনো লোকের বই কিনে দে। ঘরের বৌ ঘরে থাক্বে।"

বৃন্দাবন পরিহাসের মর্ম না বুঝে বললে, "সেই বেশ। তোর কাছ থেকে একটা লিষ্টি লিখে নেবো, ললিত। দেখিস্ তোর বৌদির প্রতি তোর একটা দায়িত্ব আছে।"

আমি মনে মনে একটা তালিকা বানিয়ে ফেললুম।

বললুম, "তারপর স্বুবর্ণর কী হলো বল্।"

"কী আর হবে, কাশী থেকে ধরা হয়ে এলো। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে কত বোঝালেন, কত মিষ্টি কথা শোনালেন। তার সেই এক উত্তর। 'আমি ব্রহ্মচারিণী হতে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী, শুনি?' তখন আমরা সবাই লজ্জায় যে যার বাড়ীতে সরে পড়্লুম।"

"আর স্বুবর্ণ?"

"স্বুবর্ণকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার মামাবাড়ী। তার বাপ নেই। মা থাকেন ঐখানে। কিন্তু নাটক নভেল কি সোজা জিনিস! মামাতো ভাইবোনে প্রেম যদি না হলো তবে আর প্রগতি কী হলো! টের পেয়ে মাসীমা স্বুবর্ণকে তার স্বামীর বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হরিপদর জীবনে ধিক্কার এসেছে। আমি তাকে ভুজঙ্গেশ্বরের ঠিকানা দিয়েছি। স্বপ্নও সে দেখে এসেছে অবিকল আমারই মতো। এদিকে স্বুবর্ণ সিনেমা দেখে ক্ষেপেছে। স্বামীর ভালো কথা তার মন্দ লাগে। সে বলে, 'না। ভোগ চাই বলে রোগ চাইনে।' শুন্লি তো?"

আমি একটু আগে স্বামীকে ধন্য বলেছিলুম। এখন স্ত্রীকে বললুম—"ধন্য।"

"ধন্য? ধন্য বল্বি তুই ওই অবাধ্য অসতী স্ত্রীকে?"

"যাক্, তুই তো এখন ওর গল্পটা শেষ কর্।"

"শেষ?" বৃন্দাবন উৎফুল্ল হয়ে বললে, "হরিপদকে আমরা হৈ হৈ করে আরেকটা বিয়ে দিলুম। এই তো সেদিন। এখনো ঢেকুর

উঠ্‌ছে সেদিনকার সেই ভূরি ভোজনের। খাওয়াতে জানে বটে হরিপদরা।"

"কিন্তু সুবর্ণর কী হলো?"

বৃন্দাবন বিরক্তির সুরে বললে, "কী হতে পারে শুনি? হিন্দুর মেয়ের স্বামী ছাড়া গতি আছে? দু দিন বাদে সব ঠিক্ হয়ে যাবে দেখিস্।"

আমি ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সব ঠিক্ হয়ে যায়নি তা হলে?"

"না। মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে এসে অনর্থ বাধায়। 'বৃন্দাবন বাবু, আপনি আমার একটা উপায় করুন। নইলে বেশ্যা হয়ে যাবো'।"

"বেশ তো। তুই একটা উপায় করিস্‌নে কেন?"

বৃন্দাবন দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, "একে ব্রাহ্মণ, তায় পরস্ত্রী।"

ফের্‌বার পথে আমি বললুম, "বৃন্দাবন, আমাকে সত্য করে বল্ দেখি সুবর্ণর ও রোগ নেই?"

"যত দূর জানি, নেই।"

"কিন্তু আমি চাই ঠিক্ জান্‌তে।"

"ঠিক্ জানিনে।"

"তা হলে ওকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। পার্‌বি এ ভার নিতে?"

"কে? আমি?" বৃন্দাবনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

"হ্যাঁ রে, তুই। আমি তো কল্‌কাতা যাচ্ছিনে। যাচ্ছিস তুই।"

"বা রে।"

"বা রে নয়। পার্‌বি কি না বল্।"

"রোস্ ভেবে দেখি।"

"ভাব্‌বার কিছু নেই। সুবর্ণর স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে কি দেয়নি?"

"ছেড়ে দেবারই সামিল।"

"কত ওর বয়স? সাবালিকা?"

"উনিশ কুড়ি।"

"তবে আর কী? ওকে বলিস্‌ আবার হারিয়ে যেতে।"

বৃন্দাবন বললে, "সত্যি বল্‌তে কি, হরিপদও তাই চায়। কেলেঙ্কারির আর বাকী আছে কী? বেশ্যা হলে ষোলো কলা পূর্ণ হবে। কল্‌কাতা শহরে হরিপদ বেচারার মুখ দেখানোর জো থাক্‌বে না। ওর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কেউ কেউ যাতায়াত কর্‌বে।"

"প্রতিবেশীদের মধ্যেও?"

"প্রতিবেশীদের মধ্যেও।"

"বলিস্‌ কি? ঐ সব ব্রহ্মচর্য্যওয়ালাদের মধ্যেও?"

"কেন নয়? পুরুষের আবার সতীত্ব!"

আমি প্রায় ক্ষেপে গেছ্‌লুম। বললুম, "সবাই তা হলে শকুনের মতো চেয়ে বসে আছে কবে ও মেয়ে মর্‌বে?"

বৃন্দাবন শিউরে উঠে বললে, "ষাট্‌, ষাট্‌! এত রূপ, এমন যৌবন,—মর্‌বে!"

"বেশ্যা হয়ে যাওয়াকে আমি মনুষ্যত্বের মরণ বলি।"

"ও সব," বৃন্দাবন প্রত্যয়ের সহিত বললে, "ভগবানের হাত। বেশ্যা না থাক্‌লে পাপী থাক্‌ত না। আর পাপী না থাক্‌লে ভগবান কাকে তরাতেন?"

এই যার যুক্তি তার সঙ্গে তর্ক বৃথা। আমি চুপ করে ভাব্‌তে থাক্‌লুম সুবর্ণর সমস্যা। ও যদি বেশ্যা হয়ে যায় তবে ঠিক্‌ যে রোগটাকে

এড়াতে চায় সেই রোগে মর্‌বে। অথচ পূর্ণ বয়সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাও যে প্রকারান্তরে নপুংসকত্ব, ক্লীবত্ব। সেও বেশ্যাবৃত্তির মতো অবমানুষিক।

কী যে সেন্টিমেণ্টাল বোধ কর্‌লুম। মনে হলো, পুরুষ হয়ে জন্মেছি কেন? যদি না নারীকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম। সমাজে যাকে নীতি বলে তার উপরেও একটি নীতি আছে। সে নীতি বীরের। সে নীতি যারা মানে তারাই একদিন হয় সমাজের নমস্ত।

পরিহাসের পরিণাম এই দাঁড়ালো যে বৃন্দাবনকে আমি একটু চাপ দিয়ে বললুম, "তুই ওকে এইখানে পাঠিয়ে দে, আমিই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবো।"

বৃন্দাবন চল্‌তে চল্‌তে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, "যে জন্যে তোর কাছে আসা সেটা এবার খুলে বলি। আমার বড় সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে আমাকে সুপারিশ কর্‌তে হবে। দেড়শো টাকার একটা vacancy হয়েছে বলেই দেড়শো মাইল ছুটে আসা।"

"কিন্তু," আমি আপত্তি কর্‌লুম, "তোর বড় সাহেবকে আমি চিনিনে। তিনি কি আমাকে চেনেন?"

"হয়েছে, হয়েছে," বৃন্দাবন আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "তোকে চিন্‌তে না পারুক তোর ব্যাঙ্কের চাকরিকে চিন্‌বে। আজকেই— বুঝ্‌লি? দুপুরের গাড়ীতেই ফির্‌বো।"

বৃন্দাবনের চলে যাওয়ার মাসখানেক পরের কথা। ভুলেই গেছলুম কী তাকে বলেছিলুম। সামাদের হাতে দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, সুখে আছি। বাবা এসে বিয়ের জন্যে সাধাসাধি করে গেছেন। রাজি হইনি। আমি ইকনমিক্‌সের ছাত্র, আমি কি এই আয়ে বিবাহ করি? বিবাহ মানে

যদি বার্থ কণ্ট্রোল হতো তবে সে ছিল উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদের শ্রীমতীরা যে মাতৃত্ব থেকে আলাদা করে পত্নীত্ব পছন্দ করেন না।

এমন সময় একদিন রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে বস্‌বার ঘরে ঢুক্‌তে যাবার মুখে থ' হয়ে দাঁড়ালুম।

কে ঐ নারী!

ব্যাচ্‌লারের বাড়ীতে নারী যেন বিধবার হাঁড়িতে মাছ। লোকে কী বল্‌বে! আমি যে একজন রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান। ক্লাবের মেম্বার!

মা ধরণী দ্বিধা হলেন না। আমার গা দিয়ে ঘাম যেতে লাগ্‌ল। আমি দাঁড়াবো কি পালাবো এই বিষয়ে পদদ্বয়ের ভিতর মতদ্বৈধ লক্ষিত হলো। ওদিকে আমার চোখ গেল আট্‌কে।

কী রূপ! পেট্রোমাক্স বাতির আলোয় সে একটি টিপায়ের উপর ঝুঁকে একখানি বিলিতী কাগজের ছবি দেখ্‌ছে—নিবিষ্টভাবে। কঠিন সংযম তার তনুকে বেঁধে রেখেছে। নইলে তা হয়তো দিকে দিকে ছড়িয়ে যেত, মিলিয়ে যেত। যেন একটি পূর্ণ প্রস্ফুট স্বর্ণগোলাপ।

কিন্তু কে সে! কেন আমার ঘরে?

আমি যে দাঁড়িয়ে রয়েছি এ সে অনুভবের দ্বারা বুঝ্‌ল। আসন থেকে উঠে আমার দিকে চাইল। কিছু বললে না, কিন্তু আমাকে যেন ইশারায় জানালে, আস্‌তে পারেন।

আমি আকৃষ্টের মতো ভিতরে গিয়ে একটু দূরে বস্‌লুম। সেও বস্‌ল বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই কর্‌লে। আমাকে তার পছন্দ হলো কি না জান্‌তে পার্‌লুম না, জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল। যেন আমি একটি বিবাহযোগ্যা বালিকা, আর সেই বিবাহোদ্যত পুরুষ।

আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হলো। কিছু একটা বলা তো উচিত। কিন্তু স্বপ্নে কথা কইতে পারা যেমন যায় না এও তেমনি। বচন প্রবৃত্তি দুর্ব্বার হলে স্বপ্নটি যাবে ভেঙে। আর এমন স্বপ্ন ভাঙুক এরূপ আগ্রহ আমার ছিল না।

আমি তার পরীক্ষমাণ দৃষ্টির লক্ষ্য হয়ে নজরবন্দী হলুম আমার আপন গৃহে। বোধ হয় এমনি করে রাত কেটে যেত। কিন্তু আমার প্রভুভক্ত বেয়ারা তা হতে দেবে কেন? সে এসে প্রশ্ন কর্‌লে, "কোনো পানীয় এনে দিতে হবে?"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। যেন ধরা পড়ে গেছি। বললুম, "য়্যাঁ! হ্যাঁ। আমার জন্যে ছোটা পেগ্‌। আর···আপনি অবশ্য চা খাবেন?"

সে কঠিন ভাবে বললে, "চা করে খাওয়াতেই আমার আসা, চা খেতে নয়।"

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, এ কি সেই—?

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম।

সে সপ্রতিভ ভাবে বললে, "আমিই স্বর্ণ।"

তখন আমি সে যে কী লজ্জায় পড়লুম তা কেউ অনুমান কর্‌তে পার্‌বে না। স্বর্ণ নিশ্চয় জানে কী জন্যে আমি তাকে চাই। একটি পূর্ণ বয়স্কা ভদ্র নারী আমার সম্বন্ধে কী না জানি ভাব্‌লে। তা জেনেও সে যে এসেছে—ছি ছি কেমন নির্লজ্জ সে!

আমি তার চোখে চোখ রাখ্‌তে শিউরে উঠ্‌ছিলুম। ভদ্রতা করে বললুম, "না, না, তা কি হয়! আপনি কেন চা কর্‌বেন?"

তার ঘন পক্ষ্মের পর্দ্দা সরিয়ে তার উজ্জ্বল তীব্র চাউনি আমার চোখের উপর টর্চের আলোর মতো পড়্‌ল। সে বললে, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনো রোগ নেই।"

আমি বিষম অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, "আ আ-মি তা-তা mean করিনি। কিছু ম-ম-নে কর্‌বেন না।" এই বলে এক হেঁচ্‌কি।

সে তখন বললে, "অনুমতি দেন তো আমিই চা করে আনি।"

আমি বললুম, "না, না, সুবর্ণ দেবী। আমার লোকজন থাক্‌তে আপনি কেন কষ্ট কর্‌বেন।"

সে ক্ষুণ্ণ হলো। বললে, "তবে আমি কোন অধিকারে এখানে থাক্‌ব ?"

আমি সত্যিই বুঝ্‌তে পারিনে কেমন করে লোকে অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করে। আমার পাপ মন বলে, ওটা ভণ্ডামি। অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির জন্যে প্রত্যেকের মনে যে ধিক্কার আছে সেই ধিক্কারটাকে মন্ত্র পড়ে শোধন করে নিলে নিজেকে ও অপরকে বঞ্চনা কর্‌তে আর বাধে না, তখন সে তো কামপ্রবৃত্তি নয়, সে ধর্ম্মসাধন, বংশরক্ষা, কঠোর কর্ত্তব্য ইত্যাদি। তখন অপরিচিতা মেয়ের গায়ে হাত দিতে অনুমতির দরকার হয় না, মন্ত্রটাই তো অনুমতি।

তবু একে যদি বিয়ে কর্‌বার উপায় থাক্‌ত আমি বিয়ে কর্‌তুম। ভণ্ডামি না করে, মনকে চোখ না ঠেরে এই দেবীপ্রতিমার মত নারীকে শয্যার অংশ দিতে আমার যে লজ্জা, যে পুলক, যে দুঃসাহস তা আমার মতো বাজে লোকের সাজে না, তা অর্জ্জুনের মতো বীরের পক্ষেই শোভন।

না, আমি বীর নই, বৃন্দাবনের কাছে বীরপনা জাহির না কর্‌লে ভালো কর্‌তুম।

আমাকে নির্ব্বাক্ দেখে সে বললে, "তা হলে এখানে আমার স্থান হবে না ?"

এর উত্তর কী দেবার আছে ? "না" বললেই ফুরিয়ে যায়। অথচ

সে চলে যাক্ এ কি আমি মুখ ফুটে বল্‌তে পারি? বিলেত থেকে এসে অবধি আমি স্ত্রী-জাতির সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বল্‌বার সুযোগ পাইনি, মামুলি আদব কায়দা বাঁচাতে বাঁচাতে জান খতম। আর এমনি এদেশে নারীদুর্ভিক্ষ যে বুড়ী মেম ও ভুঁড়িবিশিষ্ট ইঙ্গ-বঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে মিশ্‌তে পাইনে। এই মেয়েটি যখন দেড়শো মাইল দূর থেকে এসেছে তখন এর সঙ্গে দেড় ঘণ্টা আলাপ কর্‌বো না?

"দেখুন," আমি আরম্ভ কর্‌লুম। কিন্তু অগ্রসর হতে পার্‌লুম না।

সে অতিষ্ঠ বোধ কর্‌ছিল বলে বোধ হলো। "দেখুন, আপনাকে বৃন্দাবন কী জানিয়েছে—"

"বৃন্দাবনবাবু এই জানিয়েছেন যে আপনার একটি পাচিকা চাই। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, মনে হয় মন্দ রাঁধিনে। তবে বিলিতী রান্নার কথা আলাদা।"

এইবার আমি একটা ছুতো পেলুম। বললুম, "ঐটেই তো আমার পক্ষে আসল। আমি—বুঝ্‌লেন কি না—একেবারে বিশুদ্ধ বিলেতফেরৎ। গোরু ছাড়া বড় কিছু খাইনে।"

সে অবিচলিত স্বরে বললে, "যদি কেউ শিখিয়ে দেয় তাই রেঁধে খাওয়াবো।"

আমি ভড়কে গেলুম! বললুম, "তারপর—এই দেখুন—খানাই সব নয়, পিনাও আছে। ওসব বিষয়ে—বুঝ্‌লেন কিনা—আমি একেবারে সেকেলে বিলেতফেরৎ।"

সে বললে, "দেখিয়ে দিলে তাও পার্‌ব।"

এর উপর আমি আর কী বল্‌তে পারি? তবু যত রকম ভয় দেখাতে পারি দেখালুম। বললুম, "ভীষণ বদ্‌রাগী মানুষ আমি। চাবুক নিয়ে যাকে কাছে পাই তাকে মারি। তা নইলে আমার আবার ঘুম হয় না।"

সে এতক্ষণ পরে একটু মুচ্‌কি হাস্‌ল। বললে, "বেশ। না হয় দু দশ ঘা মার্‌বেন।"

তখন আমি মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললুম, "মাইনে—মাইনে কিন্তু আমি দিতে পার্‌ব না। পাচিকা চাই বলে পাচকটিকে যে ছাড়িয়ে দেবো এমন কথা তো বলিনি। ওকে ওর মাইনে না দিলে ও কি আপনাকে বিলিতী রান্না শেখাবে? উপরন্তু আপনাকে যে মাইনে দেবো—বুঝ্‌লেন কি না—আমার মাইনে থেকে উদ্বৃত্ত থাক্‌লে তো দেবো? খানাপিনাতেই সব ফুঁকে দিই।"

"আচ্ছা, আমি বিনা বেতনেই চাকরি কবুল কর্‌ছি।"

আমার ইচ্ছা কর্‌ল বলি, সুবর্ণ, তোমাকে আমি মাথায় করে রাখ্‌ব। আমার সর্ব্বস্ব তোমার। কিন্তু আমার এমন লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল তার সঙ্গে থাকার কথা ভাব্‌তে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে সর্ব্বনাশ ঘটাইনি।

আমি চুপ করে থাক্‌লুম অনেকক্ষণ।

সে উঠে এসে আমার পায়ে পড়ে বললে, "বিশ্বাস করুন। আমার ও রোগ নেই।" তার চোখ সজল। তাকে যে কী রমণীয় দেখাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ কর্‌ছিলুম, পা সরিয়ে নিতে ভুলে গেলুম। তাকে হাত ধরে তুল্‌তেও আমার সাহস হচ্ছিল না।

হৃদয়কে শক্ত করে বললুম, "কিন্তু আপনি যে পরস্ত্রী।"

সে মাথা দুলিয়ে বললে, "না। আমি আপনারই স্ত্রী।" তার অশ্রু বাধা মান্‌ল না। বোধ হয় সারাদিন অনাহারে কেটেছে—ট্রেনে। সে আমার পদস্খলন কর্‌লে।

এত কঠিনতার মধ্যেও এত কোমলতা ছিল। কিন্তু এ কী রোমান্স্‌। আমি তো আর্টিষ্ট নই, সঙ্গীতকলানিধি নই, আমি কাজের লোক, ব্যাঙ্কের

চাকুরে। তাও বৃন্দাবন যত বড় মনে করেছিল তত বড়—অর্থাৎ এজেণ্ট—নই। আমি কি রোমান্সের যোগ্য ?

সামাদ যখন চা নিয়ে এলো সে তখন তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে আঁচল খস্‌খসিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল। সামাদটা যে কী মনে কর্‌লে! অতিরিক্ত গম্ভীর ভাবে চা রেখে দিয়ে দু জনকেই সেলাম কর্‌লে। যেতে যেতে হাসাহাসি কর্‌লে বোধ হয় শুক্‌দেওরাম বেয়ারার সঙ্গে—আড়চোখে। বেয়ারাও সজোরে জুতো পালিশ কর্‌ছিল বারান্দায়।

আমি বললুম, "সুবর্ণ, তুমি বড় দুঃখিনী। কিন্তু তোমার দুঃখ দূর করা আমার অসাধ্য। দু দিন পরে তুমি চাইবে মা হতে। আমি কেমন করে তার সমর্থন করি ?"

সে বললে, "সে অনেক পরের কথা। আমি ও কথা ভাবিনি।"

আমি হেসে বললুম, "তুমি না ভাব্‌লেও প্রকৃতি ভাব্‌বেন। তাঁর নিয়ম অমোঘ।"

সে তবু বললে, "যা হবার তা হবে। এতে ভাব্‌বার কী আছে ? সংসারে কেউ কি মা হচ্ছে না ?"

"কিন্তু সমাজ যে তোমার সন্তানকে অসম্মান কর্‌বে ?"

"আপনি থাক্‌তে ?"

"আমিই বা এমন কী! আমার চেয়ে যাঁরা সব বিষয়ে বড় তাঁরাও অমন সন্তানের জনক হবার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস।"

সে বোধ হয় বিশ্বাস কর্‌লে না। এমন একটা সহজ বিষয়ে এত ভয় পাবার কী আছে ? অন্য মনে কী চিন্তা কর্‌লে। চা খেল না।

"চা খাও, চা খাও," আমি একটু পীড়াপীড়ির সুরে বললুম। "তারপর আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আস্‌ব।"

সে জ্বলে উঠে বললে, "চা খেতে আমি আসিনি।" উঠে বললে, "আর ট্রেনে ওঠানামা করতেও আমি জানি।"

তার দু বছর পরে আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা। দু চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলুম, "ভালো কথা, সুবর্ণর খবর কী?"

সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "সুবর্ণ!" তারপর হেসে বললে, "ওঃ! তোর সেই পাচিকা সুবর্ণ?"

আমি অনুতাপের সঙ্গে লজ্জা মিশিয়ে বললুম, "হ্যাঁ।"—আমার সেই উপযাচিকা সুবর্ণ!

"ওর নাম তো এখন সুবর্ণ নয়। ওর নাম ফরজন্দ্ উন্নেসা। ওর স্বামী এক পেশাওয়ারী ফলওয়ালা, আব্দেল কাদের। ওর একটি ছেলে হয়েছে, জুলফিকার। বিবি এখন ঘোর পর্দ্দানশীন।···ছি, ছি, শেষকালে মুসলমান হয়ে গেল!"

স্ত্রীর দিদি

নির্ম্মলের স্ত্রী শেফালী রূপে গুণে লক্ষ্মী। শুকতারার মতো স্থিরোজ্জ্বল তার চক্ষু, শারদ প্রভাতের মতো স্বচ্ছ সুধৌত তার মুখ, তার দেহচ্ছন্দ শরতের নদীর মতো শান্ত।

এমন মেয়েকে দেখে কার না পছন্দ হয়? নির্ম্মল তাকে এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে ফেললে। বিয়ের রাত্রে প্রথম দেখ্‌লে তার স্ত্রীর দিদি সোহিনীকে।

শেফালী যেমন শরৎঋতুর প্রতিমূর্ত্তি, সোহিনী তেমনি বর্ষাঋতুর। তার চোখ দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। বিদ্যুৎ তার স্মিত হাস্যে। বিদ্যুৎ তার পরিহাসে, রসোক্তিতে। শ্যামা মেয়ে। সতেজ স্বাস্থ্য তাকে সুদর্শনা করেছে, নইলে রূপ তার বাস্তবিক নেই। চাপা খস্‌খসে তার কণ্ঠস্বর, তবু কী যেন সম্মোহন আছে তাতে। বোধ হয় খোট্টার দেশে বিয়ে করার দরুণ স্নিগ্ধতা খুইয়েছে, কিন্তু কেমন শক্ত গাঁথুনি। গড়নে বজ্র, ধরণে বিদ্যুৎ। তার একটা না একটা অঙ্গ সমস্তক্ষণ কথা কইছে। যেন তাকে গড়্‌বার সময় বিধাতা পারদের খাদ মিশিয়েছিলেন।

সোহিনী নির্ম্মলের সঙ্গে আলাপ করে, অন্যদিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে, থেকে থেকে নির্ম্মলের দিকে চেয়ে চাউনিতে কৌতুক বিচ্ছুরিত করে। যেন নির্ম্মলের মনের ভিতরটা দেখ্‌তে পায়, যেন ওখানটাতে তামাসার কিছু আছে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা কইতে থাকে নির্ম্মলেরই সঙ্গে, অন্যান্যদেরকে একেবারে বঞ্চিত না করে।

কালো মেয়ের ভালো বর জোটেনি। মধ্যবয়সী দোজবর, এলাহাবাদের নেটিব ডাক্তার। আর শেফালীর স্বামীভাগ্য তার

গায়ের রঙের মতো ফর্সা। নির্ম্মল ঢাকার তরুণ লেকচারার। দশের কাছে দশের কাছে তার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তবু সোহিনী নির্ম্মলকে গণনার মধ্যে আনে না। তার ছোট বোনের বর—সম্বন্ধে ছোট। মানুষটিও শিষ্ট সুশীল—ছাত্র সমাজের আদর্শ যদি না হলো তবে আর অধ্যাপক কিসের?

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে দন্ত বিকাশ করে। যেন উপস্থিত ভদ্রতনয়ারা তার ছাত্রী ও এই বাসর ঘর তার ক্লাস রুম। দুটি কানের উপর রকমারি অত্যাচার যেন একটা মায়া।

সোহিনী ওদের নিষেধ করে একটা হাত তুলে, মাথাটাকে ঈষৎ দুলিয়ে। বলে, "তোরা তো বেশ। মাষ্টারের কাছে কোথায় কানগুলি গছিয়ে দিবি, না মাষ্টারের কানদুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। এবার জন্মাষ্টমীর মিছিলে তোদের সং বেরবে দেখিস্।"

নির্ম্মল ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখেছেন?"

সোহিনী অন্যদিকে চেয়ে এমন ভঙ্গীতে মাথা নাড়লে ও তার ঠিক পরে নির্ম্মলের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলে যে নির্ম্মলের দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি তড়িৎ ছুটে গেল।

স্ত্রীকে একা পেয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দিদি কতদূর পড়েছেন?"

"ফোর্থ ক্লাস অবধি"—শেফালী বললে কোনো মতে মুখ ফুটে। নব বধূত্বের সরমে সে অন্ধ হয়েছিল, কিন্তু মূক হয়নি, তা বোঝা গেল।

"ফোর্থ ক্লাস, মোটে ফোর্থ ক্লাস!"—প্রোফেসার বিস্ময়াবিষ্ট হলো।

স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শুয়ে সে ধ্যান করলে স্ত্রীর দিদিকে। ফোর্থ ক্লাস, তবু কী দীপ্তি, কী স্ফূর্ত্তি, কী সপ্রতিভতা! শেফালী তো ম্যাট্রিক

পাস। কিন্তু সোহিনীর কাছে লাগে না। শেফালী না হয়ে সোহিনী যদি আমার স্ত্রী হতো—নির্ম্মল ভাব্‌লে—তা হলে বিধাতার এমন কী ভুল হতো। বছর তিনেক আগে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে থাক্‌লে শ্বশুর মশাই কি আমাকে না দিয়ে নগেন্দ্র বাবুকে ও মেয়ে দিতেন? তবে তিন বছর আগে আমার চাকরী হয়নি। আমি রিসার্চ স্কলার। বিবাহের প্রস্তাবে বদন বিকৃত করেছি। স্বামী না হয়ে স্বামীজী হবার দিকে ছিল আমার ঝোঁক। স্ত্রী জাতি না বলে মাতৃজাতি বল্‌তুম। আনন্দ দাদাদের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতুম না। ওঁরাও আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। In anticipation ডাক্‌তেন নির্ম্মলানন্দ বলে। হায়—নির্ম্মল ভাব্‌লে—সেই মোহে হারালুম ঐ দীপ্তি, ঐ স্ফূর্ত্তি, ঐ সপ্রতিভতা! সেই তো বিয়ে কর্‌লুম, সংসারী হলুম, স্বামী হলুম, মাতৃজাতিকে সন্তান জোগানোর দায়িত্ব নিলুম, চাকরীটি পেয়েই, ব্যস্‌ বদ্‌লে গেল মতটা, মায়ের অনুরোধের কাছে জারিজুরি খাট্‌ল না। তিন বছর আগে কর্‌লে স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ অন্যরকম হতো, এই মেয়ে আমার কান ধরে টান দিত, এত লজ্জা কোথায় থাকৃত!

স্ত্রীর সঙ্গে সে রাত্রে যত কথা হলো তার বারো আনা দিদি সংক্রান্ত। অবোধ শেফালী সন্দেহ কর্‌লে না—অদ্বৈতবাদী নির্ম্মল অন্যায়টা কিছু দেখ্‌ল না।

বৌ নিয়ে নির্ম্মল ঢাকায় ফির্‌ল। মা যারপর নাই আহ্লাদিত হলেন। বোনেরা বৌদিকে ঘিরে রইল। বন্ধুরা বৌভাত খেয়ে শেফালীর স্বামীকে অভিনন্দন করে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাশি রাশি উপহার দিলেন।

কিন্তু নির্ম্মল সোহিনীকে ভুল্‌তে পারলে না।

শেফালীকে দেখ্‌লে সোহিনীর কথা মনে পড়ে। শেফালীতে সোহিনীর দীপ্তি কই? স্ফূর্ত্তি কই? সপ্রতিভতা কই? শুধু সৌন্দর্য্য, শুধু সরম, শুধু স্নিগ্ধতা। এ সব তো জগতে দুর্ল্লভ নয়, নির্ম্মলের বাড়ীতেই কিছু কিছু আছে। এর জন্যে অমন জম্‌কালো স্বামীত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে একটা সুলভ স্বামী হবার স্বার্থকতা কোথায়?

স্ত্রীর দিকে চেয়ে নির্ম্মল ভাবে, এ তো মাতৃজাতি। একে স্ত্রী বলে কল্পনা করতে সঙ্কোচ আসে।

নির্ম্মল পড়ার ঘরে বিছানা পাত্‌ল। পাড়ার লোকে ওকথা শুনে বললে, "অমন স্ত্রীর স্বামী হয়ে এমন জিতেন্দ্রিয়! পুরুষ তো নয়, মহাপুরুষ!"

আনন্দ দাদারা বললেন, "কত গৃহী পরমহংসদেবের আরাধনা করে। তাঁর অনুসরণ করে ক'জন!"

মা'র মনে কাঁটা ফুট্‌ল। তিনি বৌ মাকে নিয়ে ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে নাতির বিনিময়ে পাঁঠা মানত করে এলেন।

ওদিকে জিতেন্দ্রিয় ধ্যান করে—স্ফটিক স্বচ্ছ নয়নে পতঙ্গ চপল চাউনি, চোখে কপালে অধরে উচ্ছল নিঃশব্দ স্মিতহাস, দীঘল সবল গড়ন, ইস্পাতের মতো রং, চাপা খস্‌খসে কণ্ঠস্বর।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, "দিদি চিঠি লেখেননি?"

শেফালী বলে, "তাকে দশখানা না লিখ্‌লে কি সে একখানা লিখ্‌বে?"

নির্ম্মল ক্ষুণ্ণ হয়। জানে না যে চিঠিতে সোহিনীর অন্য মূর্ত্তি। হিজিবিজি কী যে লেখে, নিজেই পড়্‌তে পারে না। হয় তো লেখে—বহুদিন যাবৎ তোমাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত আছি। কুশলের বানান মুষলের মতো! সংবাদেও তালব্য শ।

অবোধ শেফালী সুবোধ হবার জন্যে আই-এর পড়া করছে। দেবর বিমল তার সহপাঠী। তার দিদিকে তার স্বামী কেন এতবার স্মরণ করেন তা যদি সে বুঝ্‌ত তবে অত পড়াশুনার দরকার থাক্‌ত না।

নির্ম্মল স্থির করে ফেললে—পূজার ছুটীতে এলাহাবাদ যেতেই হবে।

মা'কে বললে, "তুমি পুরী দেখ্‌তে চাও, বিমলের সঙ্গে যাও। শেফালীকে তার পিত্রালয়ে দিয়ে আমি একলা যাই পশ্চিমে। আমার সেই 'Military Strategy of the Mughals' বইখানা লিখ্‌তে হলে আগ্রা দিল্লী গোয়ালিয়র এলাহাবাদের দুর্গগুলো চাক্ষুষ করতে হয়।"

ডক্টর না হয়ে যে নির্ম্মলের নিষ্কৃতি নেই, শুধু পি-আর-এস্ যে তার পক্ষে অশোভন, কে এ কথা না জানে? মা বললেন, "তাই হোক্।"

এলাহাবাদের নগেন্দ্র বাবু পৈত্রিক অট্টালিকা ভাড়া দিয়ে নেংটি ডাক্তারের উপযুক্ত পাড়ায় ছোটখাট বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন, যা দেখে রুগী ভরসা করে ভিড়্‌বে। বাপ বড় ডাক্তার ছিলেন, বাপের নামডাকের প্রতিধ্বনিতেই তাঁর পসার। প্রথম পক্ষের তিনটি ছেলেমেয়ে তিনি ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ এই কয়জনের সংসার। ভাড়ার টাকা ও রোগী দেখার টাকায় এক রকম চলে যায়। তবে সাবেক কালের চাল আর নেই, এই যা দুঃখ।

"বেশ, বেশ, তুমি এলে, দেখা হলো, খুসি হলুম," নগেন্দ্রবাবু বললেন। "আমাদের কি কোথাও যাবার যো আছে, ভায়া। ঐ ছাখ না, রাত না পোহাতেই পাঁচ পাঁচটা রুগী এসে ধন্না দিয়ে পড়েছে। নগিন্ ডাক্তার—নগিন্ ডাক্তার না ছাড়ালে ওদের বিমার ছাড়্‌বে না। ক্যা ভইল্ রে রামখেলাওন, ক্যা ভইল্ রে বুধন্‌কী নানী?"

ভায়রা ভাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি ওদের এক জনের বুকে ষ্টেথোস্কোপ বসিয়ে দিলেন, এক জনের মুখে হাত পুরে দাঁতগুলো নাড়্‌লেন।

একটা চাকর এসে খবর দিলে, "মাইজী বোলাতেঁ হেঁ।"

নির্ম্মল তার পিছু পিছু গেল। নমস্কার কর্‌তেই সোহিনী ফিস্ ফিস্ করে সুধালো, "কদিন থাকা হবে?" তার দু' হাত জোড়া। সে নির্ম্মলের জন্যেই লুচি ভাজ্‌ছিল।

"সেটা," নির্ম্মল সুগম্ভীর স্বরে বললে, "এখানকার ফোর্ট-এর দ্রষ্টব্যতার উপর নির্ভর কর্‌ছে।"

"কি-কিসের উপর?" সোহিনী নির্ম্মলের চোখের উপর কৌতুক দৃষ্টি স্থাপন কর্‌লে।

নির্ম্মল দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, "এখানকার ফোর্ট-এ দেখ্‌বার জিনিস বেশী থাক্‌লে বেশী দিন, কম থাক্‌লে কম দিন।"

"তবু," সোহিনী পুনরায় প্রশ্ন কর্‌লে, "কম করে হলেও কদিন শুন্‌তে পাই?"

"নিশ্চয়।" নির্ম্মল বিব্রত হয়ে বললে, "ধরুন তিন দিন।"

"উহুঁ," সোহিনী বিদ্যুদ্বর্ষণ করে বললে, "অত কম কিছুতেই হতে পারে না।"

নির্ম্মল তো তাই চায়। গম্ভীর ভাবে মুচকি হাস্‌ল। তার পরে চুপ করে সোহিনীর সুগঠিত হাত দুটির নিপুণ ব্যস্ততা, তার চুড়ির নিরন্তর ওঠা নামা সপ্রশংসভাবে নিরীক্ষণ কর্‌তে থাক্‌ল। যেন সামান্য লুচি ভাজা নয়, নুরজাহানের মত সাম্রাজ্য পরিচালনা চলেছে ঐ দুখানি সুবলিত করে। পারে এমন লীলার সহিত কাজ কর্‌তে শেফালী? হুঁ, হুঁ! খালি পড়া আর পড়া!

"ওকে আন্‌লে না কেন ?"

"কাকে ?"

"ছবিকে—শেফালীকে।"

"ওঃ। ওর মা বাবা আস্‌তে দিলেন না।"

"বিরহ সইতে পার্‌ছ ?" সোহিনী লুচিগুলি দুটি থালায় সাজাতে সাজাতে অপাঙ্গে চাইল।

নির্ম্মল ভয়ে ভয়ে বললে, "ঐতিহাসিককে আরো কত কী সইতে হয়।"

"ঐতি—ঐতিহাসিক কী ?"

"যে ইতিহাস লেখে।"

সোহিনী মাথা দুলিয়ে বললে, "তাই বলো। আকবরের ছেলে বাবর না বাবরের ছেলে আকবর এই তোমরা খুঁজে বের করো। না ?"

নির্ম্মল হাসি চেপে বললে, "রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী—"

"আচ্ছা আমাদেরও তো ইতিহাস লেখা হবে হাজার বছর পরে। হবে না !"

"হবে বৈ কি।"

"এই ভিটে খুঁড়ে আজকের থালা বাটির খোঁজ এক দিন পাওয়া যাবে। না ?"

"যাবে বৈ কি।"

"তখনকার দিনের ঐতিহাসিকদের জন্যে খানকয়েক লুচি তুলে রাখ্‌তে হয়। না, মাষ্টার মশাই ?"

নির্ম্মল ভাব্‌লে প্রোফেসার ও মাষ্টারের মধ্যে তফাৎ এ জানে না, সিবিল সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তার দুই এর কাছে ডাক্তার। বললে, "আমি মাষ্টার নই, প্রোফেসার।"

সোহিনী ভ্রূভঙ্গী করলে। "প্রোফেসার তা হলে মাষ্টার নয়? পড়ায় না ছেলেদের?"

নির্ম্মল ভাবলে, যাক্ গে। জ্ঞানের চেয়ে ঐ ভঙ্গীটুকু মহার্ঘ।

লুচি চিবাতে চিবাতে নগেন্দ্রভূষণ বললেন, "গোরাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি, ভায়া। গোয়ালিয়রের গাইকবাড়, ইন্দোরের সিন্ধিয়া এঁদের কীর্ত্তিকলাপের আমি কী জানি?"

নির্ম্মল মুখ টিপে বললে, "সে হবে এখন। আমি ওকে ইতিহাসে পাকা না করে দিয়ে নড়্ছিনে।"

গোরা, কালা ও টুনী এই তিন ছাত্রছাত্রীকে পাকা করে তোল্বার ভার নিয়ে নির্ম্মল স্থায়িত্ব লাভ করলে। দুপুরের দিকে একবার দুর্গে যায়, খাতার পাতায় নক্সা এঁকে আনে। মহাগ্রন্থের খসড়া তৈরি করে। আর খুব লুচি হালুয়া ধ্বংস করে।

উপরন্তু চা।

"মাষ্টার—না, না, প্রোফেসার মশাই," সোহিনী চা দিয়ে যাবার সময় বলে, "এই নাও তোমার চা!"

"নগেনদা খেয়েছেন?"

"উনি তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন।"

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্ম্মল বলে, "ওঃ।"

"চা খুব ভালবাসো, না?"

"খু-উ-ব। যদি তেমন হাতের হয়।" নির্ম্মল ক্রমে সাহসী হয়েছিল। মেয়েদের কাছে মুখচোরা বলে আর দুর্নাম দেওয়া চলে না।

সোহিনী তার দিকে অবাক্ হয়ে তাকালে। তার সব সময় স্থির চপলার হাসি। বললে, "কেমন হাতের।"

নির্ম্মল খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বললে, "এমন হাতের।"

সোহিনীরই গায়ে জোর বেশী। সে হাতটা ছাড়িয়ে না নিয়ে সেই হাতে নির্ম্মলের গালে একটি ছোট ঠোনা মেরে বললে, "এ খাদ্য কেমন লাগ্‌ল ?"

"খু-উ-ব ভালো।"

আর একটি ঠোনা আর একটু জোরে।—"এবার কেমন লাগ্‌ল ?"

"আরো ভালো।"

আর একটি ঠোনা আর একটু জোরে।—"এবার কেমন লাগ্‌ল ?"

"আরো ভালো।"

ক্ষিপ্রতার সহিত প্রোফেসারের কানটাতে পাক দিয়ে সোহিনী সুধালো, "এটা কেমন ?"

"উপাদেয়।"

দিন দুই পরে।

সোহিনী বললে, "এখানকার দুর্গ দেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি ?"

নির্ম্মল বললে, "না।"

"তবে যে আর যাও না দেখ্‌তে ?"

"যতটা দেখছি ততটার বিবরণ গুছিয়ে লিখি আগে। তারপর যাবো আবার।"

"কই, লিখ্‌তেও তোমার তাড়া নেই।"

নির্ম্মল বুঝ্‌লে এর তাৎপর্য্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোহিনীর ঠোনা ও কানমলা খাওয়া। নগেন্দ্র একটা দবাখানা খুলেছেন, সেইখানে সারা দুপুর আড্ডা দেন, সেইখান থেকে কল্‌-এ যান। ছেলে দুটো স্কুলে, মেয়েটি পাড়ার বড় বাড়ীতে।

"হ্যাঁ, এইবার লিখ্‌ব। অনেক চিন্তা করতে হয়, তোমরা তো বোঝো না।"

"চিন্তা করার ঢং বুঝি এই?"

"আহা, মস্তিষ্ক যে সর্ব্বক্ষণ ক্রিয়া করছে; তা কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, সোহিনী?"

"দিদি বললে না যে।" সোহিনী কটাক্ষপাত করলে।

"কেন দিদি বল্‌ব?" নির্ম্মল নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে, "সত্যিকারের দিদি ত নও, সম্পর্কে দিদি।"

"সম্পর্ক বুঝি কিছুই নয়?"

"সম্পর্কটা অন্য রকম হতে পারত।"

এ কথায় সোহিনী আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

নির্ম্মল ঠাওরালো সে চোখের জল চাপা দিচ্ছে। আহা, কী অসুখী এই মেয়েটি! দোজবরে পড়েছে। ও ছাড়া আর কী হতে পারে!

নির্ম্মল উঠে দাঁড়ালো। সোহিনীর কাঁধে একটি হাত রেখে আর একটি হাতে ওর চোখ থেকে আঁচল সরালে। ও হরি! কই তার চোখে জল?

সোহিনী চুপি চুপি হাস্‌ছিল, খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল। হতভম্ব নির্ম্মলকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বললে, "আমাকে একজনদের বাড়ী যেতে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না, প্রোফেসার। বাসা পাহারা দিও।"

নির্ম্মল পরদিন কোর্টে গেল। মন দিয়ে লিখ্‌লেও কিছু। স্ত্রীকে কুশল-সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিল, তার উত্তর পেয়ে প্রত্যুত্তরে লিখ্‌লে খুব খাটতে হচ্ছে। একটা নক্সা পাঠিয়ে দিলে নমুনা হিসাবে।

তারপর যথাপূর্ব্বং।

বললে, "কাল রাত্রে নগেন দা তোমাকে এত বক্‌ছিলেন কী নিয়ে?"

"তুমি জান্‌লে কী ক'রে?"

"বা, আমার বুঝি কান নেই?"

"কিন্তু তখন তো তুমি ঘুমিয়ে!"

"আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শুন্‌তে পাই।"

সোহিনী গ্রীবাটি বেঁকিয়ে বললে, "তুমি অবাক কর্‌লে। যারা ম্যাজিক করে তারাও তো প্রোফেসার। তুমি বুঝি তাদের একজন?"

সোহিনী স্বীকার কর্‌লে না যে তার স্বামী তাকে বক্‌ছিলেন। "ও কিছু না। ওঁর মিষ্টি কথার ছাঁদই ঐ। বকুনির মতো শোনায়।"

নির্ম্মল হেসে উড়িয়ে দিলে।

"হাস্‌ছ কী মশাই। স্বামী কি স্ত্রীকে বক্‌তে পারেন?"

নির্ম্মল হাস্‌তে হাস্‌তে গড়িয়ে পড়্‌ল। তারপর সোহিনীর হাত ধরে উঠে বস্‌ল। সহসা সোহিনীকে টান দিয়ে নিজের পাশে বসালো। বললে, "সত্যি বলো। ওঁকে তুমি ভালবাসো?"

এই প্রথম সোহিনীকে গম্ভীর হতে দেখা গেল।

"বলো বলো সোহিনী! ওঁকে তুমি ভালবাসো?"

সোহিনী ঝাঁজের সহিত বললে, "কেন ওঁর অপরাধ কী? উনি প্রোফেসার নন্। এই?"

"দূর! তা কেন হবে। উনি তোমার যোগ্য?"

"আমিই কি ওঁর যোগ্য?"

নির্ম্মল আবেগের সঙ্গে বললে, "সোহিনী, তুমি কি জানো তুমি বিদুষী রূপসী কল্যাণীদের চেয়ে শ্রেয়? সোহিনী, আমার একমাত্র

দুঃখ কেন আমি তিন বছর আগে তোমাকে দেখিনি। দেখ্‌লেই বিয়ে কর্‌তুম নিশ্চিত।"

সোহিনী আবার স্বাভাবিক হেসে ভ্রূ-বাণ হেনে বললে, "কিন্তু আমি যদি ও বিয়েতে অমত কর্‌তুম?"

"কেন অমত কর্‌তে?"

"কেন কর্‌তুম না? প্রোফেসার বুঝি পুরুষ?"

"কী"

"যাও, বল্‌ব না।"

"প্রোফেসার বুঝি কী?"

"জিরাফ।"

নির্ম্মল মিনতি কর্‌লে। তখন সোহিনী পুনরুক্তি কর্‌লে, "প্রোফেসার বুঝি পুরুষ?"

এ কথা শুনে নির্ম্মল সোহিনীকে একেবারে বুকের কাছে টেনে আন্‌লে। সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌লে না। শুধু ফিস্‌ ফিসিয়ে বললে, "ছাড়ো, ছাড়ো! ছি, ছি!"

নির্ম্মল বললে, "আর বল্‌বে ও রকম কথা?"

"কী রকম কথা?"

"ঐ যে—প্রোফেসার নয় পুরুষ?"

"পুরুষ না কি?"

নির্ম্মল এর যা উত্তর দিলে তা ভয়ানক।

আরো দিন চার পরে সোহিনী বললে, "লক্ষ্মীটি, এই বেলা যাও।"

নির্ম্মল বললে, "যাব, কিন্তু তোমাকেও আস্‌তে হবে।"

সোহিনী ঘাড় নাড়্‌ল, "বোনের বাড়ীতে তুমি বোনের, আমার নও।"

"পাগল? আমি কি আর ওর পুরুষ হতে পারি?"

"না, না। ওকে অসুখী করতেও যে পারবে না তুমি?"

"কিন্তু তোমাকে অসুখী করতেও যে পারব না, রাণী।"

"একজনকে অসুখী করতেই হবে।"

"তা যদি হয় তবে তোমাকে নয়।"

সোহিনীর স্বভাব যেন বদ্‌লে গেছ্‌ল। স্বতঃস্ফূর্ত স্মিত হাসির স্থান নিয়েছিল করুণ গভীর আভা। সে বললে, "আমাকে অসুখী করলে ও অসুখী হবে না, কিন্তু ওকে অসুখী করলে আমিও অসুখী হব!"

"না, সোহিনী, তোমাকে অসুখী করব না।" নির্ম্মল বার বার এই কথা বললে। আর ছেলেমানুষের মতো সোহিনীর বুকে মুখ গুঁজ্‌ল। শিশুর মত আধো আধো স্বরে বললে, "না-আ, সোহিনী, তোমাকে অছুখী করব না-আ।"

সোহিনী খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল—"যাও! খোকা প্রোফেসার!"

এর উত্তরে সেই ভয়ানক কাণ্ড।

এমন সময় এসে পড়ল নগেন্দ্রভূষণের কন্যা টুনী। বয়স ছয় সাত বছর হবে। তাকে দেখে সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলে। তখনো তার মুখে কৌতুকের হাসি। সে কি কাউকে ডরায়।

নির্ম্মল তো মুখটাকে অসম্ভব লম্বা করে টুনীর ভয়ে টুনীর পুতুলের মত ঠায় বসে রইল।

"মেসো মশাই," টুনী জিজ্ঞাসা করলে, "মা'কে কামড়াচ্ছিলে কেন? তুমি কি কুকুর?"

কাকাবাবুর মুখ কতকটা কুকুরেরই মতো লম্বা দেখাচ্ছিল বটে। তিনি কী যেন জবাব দিতে চেষ্টা করলেন। একটা অস্ফুট ধ্বনি তাঁর কণ্ঠমূলে আট্‌কে গেল।

"বল না মেসো মশাই," টুনী আব্দার ধরলে, "কেন কামড়াচ্ছিলে মা'কে ?"

মা ওঘর থেকে ডাক্লেন, "টুনী।" টুনী ছুটে গেল। মা তাকে একটা পয়সা ঘুষ দিলেন। "যা কুল কিনে খা।"

তখনকার মতো টুনীর মুখ বন্ধ হলো, কিন্তু রাত্রে বাবার সাম্নে খুল্ল। "জানো বাবা—"

সোহিনী তাকে চোখের ইশারায় নিষেধ কর্‌লে।

"জানো বাবা, মেসো মশাই—"

সোহিনী চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ কর্‌লে। নির্ম্মলের তো তখন যায়-যায় অবস্থা। তার মুখ মরার মত সাদা হয়ে আস্‌ছিল।

নানা কারণে সেদিন নগেন্দ্র বাবু খিট্‌খিট্‌ কর্‌ছিলেন। তিনি ভেঙিয়ে বল্লেন, "জানো বাবা! কী জানো বাবা!"

টুনীর অমনি অভিমান হলো। আর দাদারা হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। "জানো বাবা! কী জানো বাবা!" "এই টুনী!"

"যাও, বল্‌ব না।" এই বলে টুনী হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাক্‌ল।

পরদিন টুনী ঠিক সেই সময়টিতে পাড়া বেড়িয়ে ফির্‌ল। উঁকি মেরে দেখ্‌লে, ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকতেই নির্ম্মল "আঃ উঃ" করে উঠ্‌ল। ভারি মাথা ধরেছে তার।

টুনী ডাক্‌লে, "মেসো মশাই।"

মেসো মশাই সাড়া দিলেন, "আঃ! উঃ! টুহু রে! মারা গেলুম রে!"

টুনী বললে, "বাবাকে খবর দিই? ওষুধ নিয়ে আসি?"

নির্ম্মল কাতরাতে থাক্‌ল, "অঃ! আঃ! ইঃ! ঈঃ! উঃ! ঊঃ!"

সোহিনী সকৌতুকে নির্ম্মলের মাথা টিপে দিতে দিতে বললে, "ওষুধ আমার কাছে আছে। তোকে যেতে হবে না।"

টুনীও মেসোর পা টিপ্‌তে বস্‌ল। কিছুতেই ও ঘর থেকে সর্‌লো না। অগত্যা নির্ম্মলের অসুখ সারল।

রাত্রে বাবাকে টুনী বললে, "মেসোমশাই আজ খুব কষ্ট পেলে। এমন মাথাব্যথা। হবে না? মানুষকে কামড়ালে মাথাব্যথা কর্‌বে না?"

মানুষকে কামড়ানোর সঙ্গে মাথাব্যথার সম্বন্ধ শুনে নগেন্দ্র ভূষণের ডাক্তারী কৌতূহল উজ্জীবিত হলো। অমন একটা কার্য্যকারণ জেনে রাখা ডাক্তার মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এবার যখন কোনো রুগী এসে বল্‌বে, "মাথা ব্যথা কর্‌ছে," তিনি গম্ভীরভাবে সুধাবেন, "মানুষকে কাম্‌ড়েছ বুঝি?"

তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কে কাকে কামড়ালো?"

নগেন্দ্র একবার তাকালেন নির্ম্মলের দিকে, একবার সোহিনীর দিকে। ইন্দ্র আর অহল্যা। ইন্দ্রটি কম্পমান। অহল্যা বেপরোয়া।

ঋষি না হোন, ঋষির বংশধর। ধ্যানে সমস্ত জান্‌লেন। প্রথমত কিছু বললেন না। পেট ভরে খেলেন চেঁছে পুঁছে। আঁচিয়ে তোয়ালেতে হাত মুছে ঢেকুর তুললেন বার কয়। পান মুখে দিয়ে কয়েকবার মুখবিকৃতি করে নির্ম্মলের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস কর্‌লেন। দেখা যাক্ তার গবেষণা সত্য না ধাপ্পা।

নোটবুক নয়, কবিতার খাতা। নির্ম্মলও কবিতা লেখে—অন্তত সবে লিখ্‌তে সুরু করেছে!

"তোমার আমার মিলন হবে বলে
আস্‌ছি কবে থেকে

(প্রেমের) পসরাটি মাথায় করে হায়
চল্‌ছি হেঁকে হেঁকে।"

নগেন্দ্রভূষণ উল্‌টিয়ে দেখ্‌লেন এই চোদ্দ দিনে সাতাশটি কবিতা জাল হয়েছে।

"তুমি ছলকিয়া চল অলকে
আমি থমকিয়া থাকি পলকে
মম অন্তরে গাহে বল কে
সখি জাগো সখি জাগো।"

অতঃপর—

"মম চুম্বন স্বাদি' লো স্বজনি
ঝঙ্ক' উঠিলি বীণার মত
বক্ষ তুহার 'চ্ছসিয়া 'চ্ছসিয়া
ক্লান্তিতে হলো মূর্চ্ছাহত।
দ্বাবিংশবার দ্রুত চুম্বনি'
অধর তুহার দিলাম প্লাবনি'
এই ভুজনীড়ে তখন আপনি
পুলকে হইলি কূজনরত।"

খাতাখানার ভিতরে গোটাচারপাঁচ লম্বা লম্বা চুল আবিষ্কার করে নগেন্দ্রভূষণ সশব্দে গলা পরিষ্কার করলেন। ডাকলেন, "ভায়া হে, এদিকে এসো।"

নির্ম্মল প্রাণের মায়া চৌকাঠের ওধারে রেখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এলো।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দূর এগিয়েছ, ঠিক বলো তো।"

নির্ম্মল বললে, "আ-আ-জ্ঞে।"

"ন্যাকা সাজ্‌ছ কেন হে? আমি কি তোমার মাথা কাটছি? তবে আমার মাথাটা তুমি কত দূর কেটে রেখেছ জান্‌তে ইচ্ছা করে। চুম্বন আলিঙ্গনের পরিখা পারে থেমেছ, না দুর্গজয় করেছ?"

"আ-আ-আ-আ-জ্ঞে।"

"তুমি তো ব্যাড্ড ভাল মানুষ হে।"

নির্ম্মল কাঁদো কাঁদো স্বরে কী বললে শোনা গেল না। বাইরে সোহিনী হেসে লুটিয়ে পড়্‌ছিল।

নগেন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বললেন, "শ্বশুর মশাই সেই শ্বশুর মশাই থাক্‌বেন, জামাই অদল বদল হলেও। অতএব এতে ভয় পাবার কী আছে!"

নির্ম্মল দু হাতে চোখ ঢাকল। সোহিনীও উঁকি মেরে তার দশা দেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

নগেন্দ্র গর্জ্জে উঠ্‌লেন, "যাও, এটিকে নিয়ে যাও। গিয়ে ওটিকে দাও পাঠিয়ে।"

ওদিকে সোহিনীর হাসি গেল দপ্‌ করে নিবে। এ দিকে নির্ম্মল ফণা তুলল।

স্তনন্ধয়

নবনীমোহন সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে সে দশ বছর বয়স অবধি মাতৃস্তন্য সেবন করেছিল। এর মধ্যে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এটা অমূলক নয়। কারণ মায়ের একমাত্র সন্তানরা একটু কিম্ভূত হয়ে থাকে। আর বড়লোকের একমাত্র পুত্রের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমি আমার উক্তির স্বপক্ষে অসংখ্য নজীর ও দৃষ্টান্ত দিতে পারতুম, কিন্তু তা হলে নবনীমোহনের গল্প না হয়ে কুমার উৎপলেন্দু রায় ও রায় বাহাদুর তারকব্রহ্ম পাল চৌধুরীর জীবনচরিত হয়ে যেত।

মোট কথা, দশ বছর ধরে নবনীমোহন স্তন্যপান না করুক স্তন্যপানের অভ্যাস রক্ষা করেছিল, এই ব্যাখ্যা বোধ হয় নিতান্ত অবিশ্বাস্য হবে না।

সেই নবনীমোহন যখন যুবক হলো তখনো সে কতক বিষয়ে তেমনি শিশুপ্রকৃতি থেকে গেল। নারী দেখ্‌লেই সে মাতৃভাবে বিগলিত হয়ে পড়ত, কথা বলত আধো আধো স্বরে। সে নারী যিনিই হোন যত বয়সেরই হোন নবনীমোহন তাঁর নিকটবর্ত্তী হয়ে নানা ছলে একবার হাতখানা ধরে ফেল্‌বেই, চুড়িগুলো নেড়ে টুং টাং করবেই, প্রশ্রয় পেলে ব্রোচটা খুলে পরিয়ে দেবে, নেক্‌লেস্‌টার সোনা খাঁটি কি না তাও একমনে যাচাই করবে, এবং—আলগোছে একটি বার স্তন স্পর্শ করবে।

তার এই দুর্ব্বলতা পুরুষদের চোখে পড়ত না। তাঁরা তাকে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ অবনীমোহনের পুত্র বলে এতই স্নেহ করতেন যে তাকে সন্দেহ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। (অবশ্য স্বপ্নে কেউ কিছু ভাবে না।) তার পর সত্যই সে সচ্চরিত্র এবং পড়াশুনাতেও সে

ভালো। (কলেজের অর্দ্ধেক প্রোফেসার যার প্রাইভেট টিউটার সে কি পড়াশুনায় ভালো না হয়ে পারে ?)

মেয়েদের মধ্যে যাঁরা মাতৃবয়সী তাঁরা কোলের ছেলেকে সন্দেহ কর্‌বেন কী ? তাতে যে তাঁদেরই মোহিনীভাব সপ্রমাণ হয়। তাঁরা ভাব্‌তেন ওটা নবনীমোহনের ইচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক।

আর যাঁরা বৌদিদি বয়সী—বন্ধুর স্ত্রী বা দিদির সখী—তাঁদের মনে একটু খট্‌কা বাধলেও তাঁরা আপত্তি কর্‌বার মতো স্পষ্ট কিছু পেতেন না। ছেলেটির চালচলন এমন আহ্লাদী-আহ্লাদী যে তাঁরা তার হাঁট্‌বার কায়দা, বস্‌বার ধরণ, আলাপের প্রণালী ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে ধরে তার আচরণকে ভারি একটা কৌতুকের বিষয় মনে কর্‌তেন। না, ওর মনে পাপ নেই, ও যে কী কর্‌তে গিয়ে কী করে ফেলেছে তা ও জানে না। হি হি হি হি। বৌদিদিরা তার পিছনে হাসাহাসি করেন। আনাড়ি, একেবারেই আনাড়ি !

কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে তিরস্কার বা কোনো নারীর কাছে অপমান না পেয়ে নবনীর আশৈশব অভ্যাস তো কাট্‌ল না। ওদিকে সে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চের উপর উঠে আশ্চর্য্য কস্‌রৎ দেখালে। সিঙ্গল্ নয় ডবল নয়, ট্রিপ্‌ল্ এম্ এ। ম্যাগাজিনের এডিটার, ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী ইত্যাদি পদে বহুদিন ধরে কায়েমী হয়ে সে মানুষ চিন্‌লে কত ! আর কত মানুষই না তাকে চিন্‌লে ! একজন লায়েক ব্যক্তি বলে সে এমনি খাতির পেলে যে তার সাহায্য না নিলে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন হয় না, ছেলেরা যে তার হাতে। নবনীমোহনের ষ্টেটমেণ্ট ও ছবি কাগজে কাগজে বেরিয়ে তার সেই নন্দদুলালী চেহারাকে কুমারী মেয়েদের মধ্যে রেষারেষির বিষয় করে তুলল।

বড়লোকের এক ছেলে, টাকার ভাবনা নেই, তাই কিছু না করার

যে আর্ট সেই আর্টের আর্টিষ্ট হলো সে। সহজে কাউকে ধরা দিলে না। নারীর কাছে যায় নারী মাতৃজাতি বলে। নারীকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারে না। তবে কেউ বিয়ে করছে শুনলে সর্ব্বাগ্রে বরযাত্র হবেন নবনী বাবু। উপহার সে শুধু সর্ব্বাদৌ দেয় তাই নয়, সব চেয়ে দামী ও সৌখীন উপহার যদি পেতে চাও তবে তোমার বিয়েতে খবর দাও নবনীকে। কষ্ট করে নিমন্ত্রণও করতে হবে না, নবনী ওসব ফর্ম্মালিটি মানে না। তোমার সঙ্গে তার কতদিনের বন্ধুত্ব—কিংবা বন্ধুত্বই আছে কি না—নবনীর পক্ষে এসব ধর্ত্তব্য নয়।

তবে নবনীর ঐ সর্ব্বনেশে স্বভাব, সে মাতৃবৎ পরদারেষু শ্লোকটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। চাণক্য পণ্ডিতের অমন মাছিমারা শিষ্য আড়াই হাজার বছরে এই একটি দেখা গেল।

বর ভ্রূক্ষেপ করে না। কে এই নিয়ে মাথা খাটায় বলো? সন্দেহ করাটাও যে ছোট লোকের কাজ। তারপর সে দিনও আর নেই যে স্ত্রীর সঙ্গে অতিথিকে বা বন্ধুকে ইনট্রোডিউস্ করে দেবে না। বন্ধুও কি সোজা ছেলে। নিজেই অন্দরে গিয়ে হাজিরা দেয়। সুপ্রসিদ্ধ অবনীমোহনের ছেলে, নিজেও নামকরা বাল-নেতা, কী রকম উপহারটা দিয়েছে মনে আছে তো?

"এই যে বৌদি," নবনী এমন নবনীর মতো করে বলে। এমন চিনির মতো হাসি হাসে। "বেশ মানিয়েছে এই শাড়ীখানা। যেমন সুন্দর আপনি তেমনি সুন্দর আপনার এই ব্যাঙ্গালোর শাড়ী। ব্যাঙ্গালোর নয়? আমাদেরই মুর্শিদাবাদী? বাস্তবিক আমাদের শুধু স্বদেশী হলে চলবে না, হতে হবে স্বপ্রদেশী। ব্যাঙ্গালোর নয়, বাঙ্গালা—এই হোক আমাদের slogan."

তারপর কখন এক সময়—

কে এত লক্ষ্য করছে বলো। নববধূ একাই হয়তো অনুভব করলেন। তাঁর কপোল আরক্ত হলো। তিনি কোনোমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। এদিকে বালগোপাল আশ্রয় করলেন পিসীমা কি মাসীমা তাকে আপ্যায়িতা অন্যতরাকে।

নবনীমোহনের শিক্ষা ভারতবর্ষে সমাপ্ত হয়নি। কিছু বাকী ছিল। সেইটে কী ভাবে সমাপ্ত হলো তাই নিয়ে আমাদের এই গল্প।

আজ হোক্ কাল হোক্ শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্যে বাঙালীকে একদিন বিলেত যেতে হবেই। কতলোক আইবুড়ো বয়সে না পেরে বুড়ো বয়সে বিলেত গিয়ে ব্যাচ্‌লার হচ্ছে, মাষ্টার হচ্ছে, ডক্টর হচ্ছে, কিছু না হোক্ শুধু ডিনার খেয়ে বা ডিপ্লোমা নিয়ে আস্‌ছে, তাদের তালিকা দিতে গেলে নবনীমোহনের এই গল্প শ্যামাদাস দত্ত বা শম্ভুনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী হয়ে উঠ্‌বে।

অতএব যুবনেতা নবনীও মা'কে না জানিয়ে সোজা কল্‌কাতা থেকে জাহাজ নিলেন। সে জাহাজ কলম্বোতে ধর্‌ল না। কাজেই অবনীমোহনও পথ থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে আন্‌বার সুযোগ পেলেন না।

স্বকীয় গবেষণার দ্বারা নবনী জেনেছিল যে অভিজ্ঞতাকে এক দেশে আবদ্ধ করাটা একদেশদর্শিতা। ওতে মানুষকে সঙ্কীর্ণমনা করে। দ্বিতীয়ত বিলেতেও মাতৃজাতি আছে। মাতৃজাতির মধ্যে জাতিভেদ ভালো নয়। 'ইনি আপন, উনি পর'—এ হলো লঘুচেতাদের গণনা। যাঁরা উদারচরিত তাঁরা বসুধার প্রতি নারীকে তাঁদের আপন জননী ভেবে শিশুর পক্ষে যা স্বাভাবিক দাবী সেই দাবী করেন।

নবনী প্রচুর টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। বাপও আরো পাঠিয়ে দিলেন। এই টাকায় সে বিলেতেও কিছু না করার আর্ট আয়ত্ত করলে। দেশের

কাগজওয়ালাদের দিয়ে ছাপালে ওখানে সে বিলক্ষণ ক্লেশ স্বীকার করে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লোকমত গঠন করছে।

মুশকিল হলো এই যে বিদেশিনীদের গলায় হারও নেই, কাঁধে ব্রোচও নেই, তাঁরা হাতে চুড়িও পরেন না। আর তাঁদের ফ্রকের গুণগ্রাহিগণ তাতে হাতও দিতে পারেন না—সে জিনিষ এতই আঁটসাট, এতই খাটো।

নবনী ছিল বাস্তবিকই সচ্চরিত্র—অবশ্য প্রচলিত অর্থে। সে অন্য অনেকের মতো মেয়ে মানুষ নিয়ে যা তা করলে না। তার যে বিশিষ্ট গবেষণা সেই গবেষণাই তার স্বধর্ম্ম। পরধর্ম্ম ভয়াবহ বলেই হোক্ বা চরিত্রের দৃঢ়তা বশতই হোক্ নবনী অন্যান্যদের দলে ভিড়্ল না।

বিলেতে ভারতীয় যুবকদের এই স্ত্রীতত্ত্ববিদ্ দলটি এটিতে নাম না লেখালে তোমার অদৃষ্ট মন্দ। এরা তোমার চরিত্রের উপর কড়া পাহারা বসাবে। যদি নিতান্ত শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে থাকো তবে তুমি তরে গেলে। আর যদি তোমার প্রাণে একটু রসবোধ থাকে, যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু হেসে একটি কথা কইলে অমনি চর মহলে সাড়া পড়ে গেল। চরাচর জান্ল যে তুমি সেই মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছ। লেখ, লেখ তার বাবাকে, মামাকে, শ্বশুরকে, মুরুব্বিকে। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়।

বেচারা নবনীর করুণ উদ্যমকে—যে উদ্যম এতই মৌলিক যে নবনীর পথে আর পথিক নেই—এই চর সম্প্রদায় ভুল বুঝ্লে। সে একে তাকে লম্বাচওড়া উপহার কিনে দেয়—কেন? থিয়েটারে বায়োস্কোপে নিয়ে দামী আসনে বসায়—কেন? বড় বড় রেস্তোরাঁতে এবেলা ওবেলা খাওয়ায়—কেন? এত খরচ যে জন্যে তা কি শুধু একটুখানি স্তনস্পর্শ? বিশ্বাস করবে কেউ এ কথা?

চরবৃন্দ অবনীমোহনকে বেনামী লিখে সতর্ক করে দিলেন। অবনীমোহন পুত্রকে পত্র লিখ্লেন, "বাপু হে, স্ত্রীলোক অতি ভীষণ প্রাণী, শৃঙ্গীণাং শতহস্তেন, কিন্তু স্ত্রীণাং সহস্র ক্রোশেণ। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবা।"

নবনী অবশ্য চলে এলো না। কিন্তু তার মস্তিষ্কে প্রবেশ কর্‌লে যে ইংলণ্ডে তার হিতৈষী আছে। তখন তার ধারণা হলো যে ইংলণ্ডের ডক্টরেট্ যে-সে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ লিখ্ছে "বাংলা নাটক" সম্বন্ধে— যার অস্তিত্ব নেই; কেউ লিখ্ছে "ভারতীয় ধনুর্ব্বিদ্যা"র উপর— যার বর্ণনা মহাভারতে আছে। ওর চেয়ে দুষ্প্রাপ্য প্যারিসের দক্তর উপাধি।

ভিতরে ভিতরে সে ইংরেজ রমণীকুলের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তারা যেন মাতৃজাতিই নয়। তাদের ওভারকোট পরিয়ে দেবার ছলে নবনীর হাত একটু চুলবুল করেছে কি, অমনি তারা সে হাত রূঢ়ভাবে ঠেলে দিয়েছে। নবনী বুঝ্তে পারে না, যারা তার বুকে বুক ঠেকিয়ে নাচ্তে পেলে সুখী হয়ে যায় তার চেয়ে নির্দ্দোষ বিষয়ে কেন তাদের এত আপত্তি। নবনী সাব্যস্ত কর্‌লে ইংরেজ জাতটাই লজিক্ জানে না।

নবনী তো গেল প্যারিসে। দেশের কাগজে ছাপা হলো ফ্রান্সে নবনীমোহন ভারতমিত্র মণ্ডলী স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছেন।

কিন্তু প্যারিস বড় দুরন্ত জায়গা। সেখানে নবনীমোহন যে ঘোল পান কর্‌তেন তাতে তাঁর স্তন্য পিপাসা এ জন্মের মতো মিটে গেল।

নবনীর সাধ গেল, সে cabaret-তে নাচ্‌বে। না জানি কার পরামর্শে এমন এক কাবারেতে গিয়ে উপস্থিত হলো যেখানে আলিবাবার

মতো সুড়ঙ্গ দিয়ে সুড়্ সুড়্ করে নেমে যেতে হয়। আলিবাবার মন্ত্র মনে রাখ্‌লে আবার উঠে আসাও যায়। কিন্তু যে হতভাগ্য মন্ত্র ভুল্‌ল তার হয় আলিবাবার শত্রুর মতো নিঃসহায় মৃত্যু—অন্তত তার উপর দিয়ে হয়ে যায় নিষ্ঠুর দস্যুতা।

দাদা তো নেমে গেলেন একা। সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কোনো ভারতীয়কে, পাছে সে চরবৃত্তি করে। প্রথমেই কর্‌লেন যথারীতি একটি বোতল খরিদ এবং একটি সঙ্গিনী নির্ব্বাচন। এতগুলি কলপ-মাখা-চুল, সুরমা-আঁকা-চোখের-পাতা, ক্ষুর-দিয়ে-কামিয়ে-পেন্‌সিল-দিয়ে-লেখা-ভুরু, রুজ্-রঞ্জিত-ওষ্ঠাধার জাল তরুণীর থেকে একটি নির্ব্বাচন কর্‌তে কেবল নয়নের নয় মস্তিষ্কেরও পরীক্ষা হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিদ্যা শেখায় না।

নবনী ঐ নির্ব্বাচন কার্য্যে শিশুত্ব দেখালে। যে "তরুণী"টিকে নির্ব্বাচন কর্‌লে সে তো উল্লাসে কলধ্বনি কর্‌তে থাক্‌ল। কিন্তু তার ভাষার যদি নবনী এক ছটাক বুঝ্‌ত। তবে রক্ষা এই যে প্রমোদের সময় স্ত্রী-পুরুষে ভাষার অভাব হয় না, স্বয়ং প্রকৃতি হন্ তাদের দোভাষী।

এক চোট নাচ হয়ে যাবার পর সঙ্গিনী জানালে, চলো, নিরালায় কিছু পানভোজন করা যাক্। নবনী জানালে, নিশ্চয়! তবে পান আমি নিজে কর্‌বো না।

নিরালায় নবনীর গবেষণা সুরু হলো। সে দেখ্‌লে "যুবতী"টির বক্ষে এক ছড়া পাথরের মালা। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কী পাথর?"

"যুবতী" ইংরেজী বুঝ্‌ল না, ইঙ্গিত বুঝ্‌ল। ফড়্ ফড়্ করে বুকের কাপড় খুলে কপট লজ্জায় দুই চোখ ঢাক্‌ল।

নবনী কোনোদিন অনাবৃত স্তন দেখেনি। দেখে প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কী! চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "Obscene! Obscene!"

এই স্থলে বলে রাখ্‌তে হয় নবনী হচ্ছে সেই জাতের মরালিষ্ট্‌ যাঁরা দুই তিন পক্ষ বিয়ে করেন, এক আধ ডজন পুত্রকন্যার জনক হন্‌, তবু কেউ যদি কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ কর্‌লে অমনি চেঁচিয়ে ওঠেন, "Obscene ! Obscene !"

দাদা তো চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "Obscene ! Obscene !" সুন্দরী বুঝ্‌লেন, "চমৎকার ! চমৎকার !" তখন বিনা আড়ম্বরে একে একে প্রতি অঙ্গ উন্মোচন কর্‌লেন।

নবনী এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার সংজ্ঞা লোপ হলো।

যখন তার সংজ্ঞা ফির্‌ল তখন সে দেখ্‌লে এক বিকটাকার পুরুষ তাকে চক্ষু দিয়ে গ্রাস কর্‌ছে। এই রাহুর ফরাসী আখ্যা apache অর্থাৎ গুণ্ডা।

রাহুটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে, "তুই আমার বালিকা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে তার সতীত্বনাশ কর্‌তে যাচ্ছিলি। অরে দুরাচার, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা। আজ তোর প্রাণ নেবো।"

এ কথা শুনে নবনীর যেটুকু সংজ্ঞা ফিরেছিল সেটুকু বুঝি যায়।

"বালিকা স্ত্রী"টি জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। "স্বামী"কে তার "প্রণয়ী"র প্রাণ নিতে উদ্যত দেখে তার চোখে জল এলো। সে হাঁটুগেড়ে করযোড়ে "প্রণয়ী"র প্রাণভিক্ষা কর্‌লে।

"স্বামী" বললেন, "এ লোকটা বিদেশী। বিদেশী-মাত্রেই ফ্রান্সের অতিথি। একে মার্জ্জনা কর্‌লুম। কিন্তু আমার মতো মানী লোকের মানটি যে গেল তার খেসারৎ দিতে হবে একে।"

নবনী এতক্ষণ একমনে ভগবানকে ডাকৃছিল। বললে, "দোহাই

ধর্ম্মাবতার। আমার প্রাণটি ছেড়ে আপনি অন্য যা কিছু নিতে চান সমস্ত নিন্" এই বলে সে তার টাকার থলিটি কম্পিত হস্তে গুণ্ডার চরণে নিবেদন কর্‌লে। যেন গুণ্ডাই ভগবান।

গুণ্ডা গুণে দেখ্‌লে কিছু কম পক্ষে এক হাজার ফ্রাঁ। উৎফুল্ল হয়ে বললে, "Merci bien! এখন তোমাকে বাসায় যেতে হবে তো। রাখো দশ ফ্রাঁ সঙ্গে। ওরে কুলটা, যা তোর নাগরকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আয়।"

নবনী বাবাকে তার কর্‌লে, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। দেশে রওনা হচ্ছি। জাহাজের নাম নল্‌ডেরা।"

বিভীষিকা

সেনের স্ত্রী একালের মেয়ে। সভাটা সমিতিটা নিয়ে অবসর কাটান। সেনের তাতে আপত্তি নেই, তবে খুব বেশী আস্থাও নেই। তার দুঃখ এই যে সমাজের যেখানে যত অনাথা মেয়ে ছিল তারা সমিতির সূত্র ধরে তার স্ত্রীর পোষ্য হয়েছে।

এই পোষ্যদের একতমার নাম শৈল। আবাল্য বিধবা, মধ্যবয়সিনী। ন্যাড়া মাথা, মুখে বসন্তের দাগ, দাঁতগুলি গজহস্তীর মতো। সেন তার স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে বলে, "এই পোষ্যটি তো ভারি নিরাপদ। এর সঙ্গে কথা কইতে পারা যায় দেখ্‌ছি।"

স্ত্রীর ইচ্ছা শৈলকে যাবজ্জীবন অন্ন সংস্থানের জন্যে কোনো একটা বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। বেচারি কতদিন পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে। সেন বলে, "স্ত্রী স্বাধীনতার পরিণাম তো এই। সমিতি করে স্বামীর গলগ্রহ সংখ্যা বাড়ানো।"

যতদিন তারা মফঃস্বলে ছিল শৈলর জন্যে কিছু করে উঠ্‌তে পারেনি। এতদিন পরে কল্‌কাতায় বদলী হয়ে স্বামীস্ত্রীতে এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হলো। চিঠি লিখে শৈলকেও আনিয়ে নিলে।

এখন শৈল হচ্ছে পড়াশুনায় এত কাঁচা যে তাকে কোনো 'সদন' বা 'ভবন' ভর্ত্তি করে নিতে চায় না। অথচ স্কুলে যাবার বয়সও তার নয়। নানা স্থানে চিঠি লিখে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে সন্ধান করিয়েও শৈলর কোনো সুরাহা হলো না। প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই চাইলে ফী কিংবা চাঁদা।

এদিকে শৈল যে বাড়ীতে ছু পাতা পড়বে তার লক্ষণ দেখালে না। তার প্রধান কাজ সারাদিন ফ্যান্ খুলে দিয়ে বিছানায় পড়ে ভাবা, আর রাত্রে ফ্যান্ খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়া। এও একরকম পড়া। সেন তার স্ত্রীকে বললে, "শৈল যে রকম পড়ছে শুয়ে শুয়েই ডিগ্রী পাবে।"

স্ত্রী ওকে দু'তিনবার কথা প্রসঙ্গে বললেন যে ফ্যান্ লাইটে বিস্তর খরচ। আর সব সময় দরকারও হয় না। সেনরা নিজেরাই হিসাব করে ব্যবহার করে। কিন্তু শৈল ঐ ইঙ্গিত বুঝল না। ভোরে যখন হাওয়া দিচ্ছে তখনও জানালা, দরজা বন্ধ রেখে শৈল ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। সেই ফানের ভন্ ভন্ শুনে সেনের মাথা বন্ বন্ করে। সেন বলে, "এক শৈলর ফ্যানের জন্যে দশ বারো টাকা বিল্ করবে দেখো।"

স্ত্রী বলেন, "তা হোক্। এই নিয়ে অত মাথা ঘামালে মনটা ছোট হয়ে যাবে।"

বেচারা সেন বিল্ ও দিল দুইয়ের মধ্যে মিল রাখতে না পেরে কোনো আশ্রমে চাঁদা দিয়েও শৈলকে পাঠাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রী শৈলর উপর অতিরিক্ত সদয় হয়ে উঠেছিলেন, সেনের প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

শৈল নাকি খোকনকে ভারি ভালোবাসে। খোকনও তার কাছে থাকতে পেলে মাকে ভুলে থাকে। শৈলই তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, তার সঙ্গে খেলা করে। সেন এ খবর পেয়ে ভাবলে বিধবা মানুষ, নিঃসন্তানা, এই তার জীবনে এক আনন্দ সার্থকতা। আহা, খোকনকে নিয়েই থাকুক্ সে। সেনের ভাব আন্দাজ করে স্ত্রী বললেন, "খোকার নতুন মা তোমাকেও দেখবে শুনবে। আমি এবার নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি।"

সেন বললে, "তুমিও শেষকালে সন্দেহী হলে। তোমার কি বিশ্বাস পদ্মে যার রুচি শৈবালে তার রুচি হবে?"

এখন সেনের স্ত্রীর নাম কমলা। সে প্রীত হয়ে বললে, "যাও।"

শৈল সেনদের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে থেকে গেল। সেনের স্ত্রী আয়া রাখেননি। আয়ারা যে দুশ্চরিত্রা হয়ে থাকে (কতকটা) সে কারণেও, আবার তারা নাকি শিশুকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়ায় (প্রধানত) সে কারণেও। এতদিন তিনি নিজেই আয়ার কাজ করতেন, বেয়ারার সাহায্যে। এখন শৈলকে পেয়ে তাঁর ভাবনা গেল।

শৈলও যেন বর্ত্তে গেল। প্রায় ছুটে এসে বলে, "কমল, খোকা—করেছে। আমি তুলি ফেলে দিই?"

সেনরা লক্ষ্য করল শৈলর তাতে মহা উৎসাহ। খোকন কিছু একটা করলে সেও শিশুর মতো দৌড়াদৌড়ি করে। তার সোরগোল শুনে বাইরের লোক ভাবে বাড়ীতে কিসের উৎসব। আর খোকন যদি কিছু না করে তবে শৈলর তাই নিয়ে অতি দুশ্চিন্তা। পঞ্চাশবার জানিয়ে যায় খোকনের তো এখনো কিছু হলো না।

সেন স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে বলে, "ও জাতে কী? ধাঙড় নয় তো?"

স্ত্রী বলেন, "এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের দিনে এ সব মামুলি পরিহাস ভালো নয়।"

তবে তিনিও চুপি চুপি হাসেন। শিশুর আবর্জ্জনা সম্বন্ধে মা'র মনে বিকার নেই, কিন্তু কোন মা তার জন্যে গর্ব্বে স্ফীত হন্?—"খোকন আজ যা করেছে তা এমন চমৎকার হয়েছে! একটা দেখ্‌বার মতো জিনিস হয়েছে, কমল।"

একটা মানুষ বাড়ীতে এক মাস থাকলে সে যদি মেয়েমানুষ হয়ে থাকে তবে বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে ঘোমটা-খোলা কথাবার্ত্তা না করে

পারে না। আর শৈলকেও যতটা অবগুণ্ঠিতার মত দেখায় ততটা সে নয়।

তার অন্তহীন কৌতূহল সেনদের স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধটাকে ঘিরে।

কথায় কথায় সে ঐ একটি প্রসঙ্গই পাড়ে, আর সেনের স্ত্রীকে পরামর্শ দেয়, উপদেশ দেয়। স্ত্রীর নাকি স্বামীর উপর দস্তুর মতো নজর রাখা উচিত। তিনি নাকি স্বামীর যথেষ্ট তত্ত্ব নিচ্ছেন না। প্রত্যেক রাত্রে যে তাঁরা একত্র শোন্ না সেটাতে স্ত্রীর বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বামীস্ত্রীতে খুব ভালোবাসা আছে বলে দৃশ্যমান হয় বটে, কিন্তু স্বামীকে প্রত্যহ সন্তুষ্ট না কর্‌লে সে ভালোবাসা তলে তলে ক্ষয়ে যায়।

এমনি সব উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে শৈল প্রশ্নও করে বড় কম না। প্রশ্নগুলো যেমন অন্তরঙ্গ তেমনি অদ্ভুত। তার থেকে বোঝা যায় তার নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষীণাতিক্ষীণ। আবার এও বোঝা যায় যে সে পরের অভিজ্ঞতার সংবাদ রাখ্‌তে অভ্যস্ত।

সেনের স্ত্রী দু'একবার রাগ কর্‌বার চেষ্টা করে দেখ্‌লেন শৈল দম্‌বার পাত্রী নয়। তার যা বক্তব্য তা সে বল্‌বেই। তখন তিনি কৌতুক বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। লেখাপড়ায় যে 'অজ' 'আম' অবধি উন্নতি করেছে, আর পারেনি, পার্‌তে চায়ও না, সেই মানুষ অন্য বিষয়ে একজন অথারিটি!

স্বামীকে বললেন, "ওকে একটা বিয়ে দিতে হচ্ছে।"

সেন বললে, "আজকালকার দিনে বিধবা বিবাহ কর্‌তে যদিও অনেকের সাহস হবে তবু কার এত মনের জোর যে অমন সুরূপা ও সুনবীনাকে গ্রহণ কর্‌বে?"

বস্তুত ওর দ্বারা ঐ আয়ার চাকরি ছাড়া আর কী যে হতে পারে তা সেনরা খুঁজে পায় না। কিন্তু অমন প্রস্তাবে ও রাজি হবে না। ও যে

ভদ্রঘরের মেয়ে! বিনা প্রস্তাবে বিনা নিযুক্তিতে সে আয়ার কাজই কর্‌তে থাক্‌ল।

খোকনকে সঙ্গে নিয়ে বা একা রেখে যেতে পার্‌তেন না বলে সেনের স্ত্রীর রাত্রে কোথাও বড় একটা যাওয়া হতো না। কিন্তু শৈল খোকনের ভার নেওয়ায় তিনি রোজ টকিতে চললেন। বলা বাহুল্য তাঁর না হওয়ায় সেনেরও টকিতে যাওয়া হতো না, এর জন্যে সেন কতবার আয়া রাখ্‌তে বলেছে ও স্ত্রীকে নারাজ দেখে মনে মনে ধরে নিয়েছে যে স্ত্রী বোধ করি আয়া সম্বন্ধে স্বামীর আগ্রহটাকে সন্দেহ করেন।

টকিতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লেশমাত্র মনোমালিন্য রইল না। তারা ভারি হাল্‌কা বোধ কর্‌লে। এবং এর জন্যে সাধুবাদ দিলে শৈলকে।

বাড়ী ফিরে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, "খোকন কাঁদেনি তো?"

শৈল বলে, "না। শুধু একবার—করেছিল।"

খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মাও ফিরেছেন, আর শৈলর এ ঘরে কাজ কী? সে যায় নিজের ঘরে। তবে কুণ্ঠার সহিত। যাবার আগে সেনদের বিছানাটার উপর পড়ে তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি। আহা, এই এক বিছানা আর ওই এক বিছানা!

খোকনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

শৈলর বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। সকলে বলেন ওকে আগে কিছু লেখাপড়া শেখাতে হবে। ওটুকু লেখাপড়া শিখ্‌তেই তার লাগ্‌বে তিন চার বছর। তারপর আরো দুই তিন বছর ধরে বৃত্তিশিক্ষা। তবেই হবে সে স্বাবলম্বী। ততদিন তার শিক্ষায় খরচ দিতে সেনের আন্তরিক আপত্তি। সেন বলে, "আমাদের আত্মীয় আত্মীয়ার মধ্যে সাহায্যপ্রার্থী রয়েছে কত। তাদের দাবী আগে। আর স্বাবলম্বনের জন্যে শিক্ষারই বা আবশ্যক কী? এই তো বেশ আয়ার

কাজ চালাচ্ছে। আমি ওর খ্যান্ খরচা কেটে রেখে কিছু মাইনেও দিতে প্রস্তুত আছি।"

স্ত্রী বলেন, "না, না। আমরা ওকে হাতে পেয়ে ওর স্নেহপ্রবণতার সুবিধা নিচ্ছি। ও চায় সারা জীবনের একটা সংস্থান। আয়া হয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে, এ কী অনাসৃষ্টি কথা।"

স্ত্রী বলেন বটে, কিন্তু গা করেন না। শৈল থেকে তাঁর হাতে সময় এসেছে। রাশি রাশি টাকার চেয়ে যৌবনকালে একটুখানি সময়ের দাম কম নয়।

আর শৈলও আছে ভালো। এই গরমে ওর দেশে ওর সম্বল ছিল হাত পাখা। এখনো সেই হাত পাখা ওর সঙ্গে আছে। তাতে নাম লেখা—"শৈলবালা দেবী।" সেটা দিয়ে বাতাস করতে যে কসরৎটা হতো তা বেঁচেছে, সেটার উত্তাপহারিণী শক্তির উল্লেখ নাই করলুম। মামার সংসারের খাটুনি ও বকুনি থেকে রেহাই পেয়ে শৈল এ সংসারে দিব্যি আরামে আছে। তার শরীরের পুষ্টি—এমন কি তার মুখশ্রীতে লাবণ্যসঞ্চার—ঘোষণা করছে তার ইদানীন্তন স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীনতাও তার অননুভূতপূর্ব্ব। সেনের স্ত্রী তার ছোট বোন। ছোট বোনকে সে ভয়ই বা করবে কেন, আর ছোট বোনের অনুমতিই বা কেন নেবে? তার যখন যা খেতে মন যায় তা ঠাকুরকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিয়ে খায়। তবে সে কাশীতে গয়াতে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়ে অনেক মুখরোচক খাদ্য ত্যাগ করে এসেছে। সেন বলে, "তাতে তার দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়। নতুবা এ বেলা মালপোয়া ও বেলা রাবড়ি খেতে খেতে ওর এমনি অভ্যাস হয়ে যেত যে ওর স্বাবলম্বনের আয়ে কুলাত না। কিন্তু ও যে ক্রমেই কঠিন কাজের অযোগ্য হয়ে উঠছে, স্বাবলম্বী হবে কী করে?"

স্ত্রী বলেন, "ও যা কর্‌ছে তাই বড় সহজ নয়। একটা শিশুর স্বাস্থ্য ওর হেপাজতে। এমন সচ্চরিত্রা আয়াই বা পাবো কোথায়?"

তারপর সেন নিজের চরকায় তেল দিতে অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিল। শৈলর কী হলো না হলো খোঁজ নেবার অবসর পায়নি। কদাচিৎ স্ত্রী ওর প্রসঙ্গ তুললে সেন বল্‌ত, "ওসব মেয়েলি ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ কর্‌তে চাইনে।"

এক হিসাবে দেখ্‌তে গেলে শৈল তার স্ত্রীর সত্যিকার দিদিও তো হ'তে পার্‌ত, খোকনের সত্যিকার মাসিমা। শৈল যে খুশি হয়ে আয়ার কাজ কর্‌ছে এর নিশ্চয়ই একটা moral effect আছে খোকনের উপর। বিধবা পিসীমা মাসিমারাও তো আশ্রিতা হলে তাই কর্‌তেন। আমাদের বিধবারা দেবী। তাঁদের ঐ দেবীত্ব আমাদের পক্ষে ভারি সুবিধের। তাতে ঘরের টাকা বাইরে যায় না। অধিকন্তু ছেলেমেয়েগুলোর উপর moral effect যা হয় তাতে তারা মানুষ হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন স্ত্রী এসে বললেন, "শৈল কি তোমার বাড়ী ঝি-গিরি কর্‌তে এসেছে!"

সেন বললে, "না। তিনি তোমার বিধবা দিদি। তিনি দেবী।"

"ওর শিক্ষার জন্যে তুমি কী কর্‌লে?"

"আমি এক সঙ্গে ক'টা দিক্ দেখ্‌বো? তুমি আপিসে যাও তো আমি 'সদনে' 'ভবনে' 'সভা'য় 'সমিতি'তে যাই।"

তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরে জেদ ধরে বললেন, "না, না, একটা কিছু করা উচিত। ওকে আর আমি এখানে থাক্‌তে দেবো না।"

সেন ভাব্‌লে, কোনো ঈর্ষার কারণ দিয়েছে নাকি সে। ভয়ে ভয়ে বললে, "কী হয়েছে?"

তিনি উগ্রমূর্ত্তি ধরে বললেন, "এই সবের জন্য আমি আয়া রাখ্‌তে চাইনি।"

সেন মনে মনে রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়্‌ল। তবু পরিহাসের ছলে জিজ্ঞাসা করলে, "কমলবনের মধুপ আজি কী অপরাধে অপরাধী?"

তিনি হেসে ফেললেন। "না, তা নয়। কিন্তু এ যে আরো ভয়ানক।"

স্বামীর সহিত আচরণের চেয়ে নারীর পক্ষে আরো ভয়ানক কী হতে পারে। সেন তা আন্দাজ করতে পারলে না। বসে পড়ে বললে, "আরো ভয়ানক! গয়না চুরি করেছে?"

তিনিও হাস্‌তে হাস্‌তে বসে পড়্‌লেন। "তোমরা আমাকে পাগল করে তুলবে দেখ্‌ছি। একজন দিলে ভয় পাইয়ে, আরেক জন দিচ্ছেন হাসি পাইয়ে।"

তিনি যে বিবরণ দিলেন তা শুনে সেনেরও আতঙ্কে রোমকম্প হলো। উদ্বেগে মাথার চুল উঠে যাবার দাখিল। দুই হাতে মাথা ধরে সেন বললে, "ও আপদকে আস্‌তে লিখেছিল কে? আমি তো এই আশঙ্কায় নিঃসন্তানা বিধবাদের প্রতি বিরূপ। দাও ওটাকে বিধবাবিবাহ সহায়ক সভায় পাঠিয়ে।"

স্ত্রী (নিজের) দুই কান মলে বললেন, "আমিও কান মলছি। আর কখনো খোকনকে যারা মা হয়নি তাদের কাছে ছেড়ে দেবো না। তুমি টকিতে যেতে চাও তো আরেকটি বিয়ে করো।"—তিনি কেঁদে ফেললেন।

চুপি চুপি

বনোয়ারীলাল তার স্ত্রী ইন্দুকে চুপি চুপি বললে, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

ইন্দু সাশ্চর্য্যে বললে, "আমার সঙ্গে?" সকৌতূহলে বললে, "কী কথা?"

"ভয়ে বল্‌ব কি নির্ভয়ে বল্‌ব?"—বনোয়ারীর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। যেন সে হাসি চাপ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

"না, আমার শুনে কাজ নেই।" ইন্দু খিল খিল করে হেসে বললে, "তুমি যা বল্‌বে তা আমি জানি।"

"তাই নাকি?" বনোয়ারী সকৌতুকে বললে, "বলো দেখি আমি কী বল্‌ব?"

"কী বল্‌বে?" ইন্দু মাথা দুলিয়ে বললে, "বল্‌বে—এই—একটা কিছু তামাসার কথা। কোথায় কারুর কাছে শুনে এসেছ।"

"না, না।" বনোয়ারী পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেল। "না, না, তামাসা নয়। সত্যি। আমি ভারি ভাবিত হয়ে পড়েছি।"

ইন্দুও ভাবিত হলো। তবু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ! তুমি ভাব্‌বে। হাসি ছাড়া তোমার মুখে অন্য কিছু কি কেউ কোনোদিন দেখেছে? মা গো, বিদূষক যদি কেউ থাকে এ যুগে তবে সে তুমি।"

বনোয়ারী সখেদে বললে, "আমি ভাব্‌ব না তো কে ভাব্‌বে, ইন্দু। বেকার বসে আছি শ্বশুরবাড়ীতে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গোটা দুই ছেলেমেয়ে হয়ে গেল। আরো হবে যদি না—"

"যদি না ?"—ইন্দু ভ্রূকুঞ্চন করলে।

বনোয়ারী ইন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যে বললে তা আমরা আড়ি পেতে শুনিনি।

ইন্দু ক্রোধে লজ্জায় উত্তেজনায় ও ঘৃণায় অপরূপ হয়ে বললে, "ভদ্রলোকের ছেলে না তুমি ? ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন কথা বলতে তোমার সাহস হয় ?"

"চুপ, চুপ, ইন্দু! চুপ, চুপ!"

"চুপ, চুপ ? চুপ করব কেন ? বলব গিয়ে মা'কে, বলব বাবাকে, বলব সবাইকে।"

"লক্ষীটি—"

"ছাড়ো, হাত ছাড়ো। ভিজে বেড়াল। আমি ভাবলুম কী নতুন তামাসার কথাই শোনাবেন। না, জন্মসংযম—"

"তোমার পায়ে পড়ি, ইন্দু!"

"ও কী! ছি, ছি! তোমার আজ হয়েছে কী ?"

এর দু বছর পরে বনোয়ারীর চাকরী হলো। চাকরীই যখন হলো তখন আরো একটি ছেলে হয়েছে বলে চিন্তা করা অশোভন। বনোয়ারী বরঞ্চ খুশি হয়ে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে ঘটা করে আপিসের লোকজনকে খাওয়ালে। বললে, "এ আমার তৃতীয় সন্তানের কল্যাণে।" ছেলেটি পয়মন্ত।

চতুর্থ সন্তানটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে—সে আরো বছর দেড়েক পরের কথা—তখন যমে মানুষে টানাটানি। যাকে বলে tug of war. একবার যম বলে, "হেঁইও।" একবার মানুষ বলে "হেঁইও।" অবশেষে

যমই হলো কাবু। প্রায় আঠারো মাসের সঞ্চয় ডাক্তারকে সঁপে দিয়ে বনোয়ারী শুনলে ডাক্তারের এই প্রশ্ন, "আপনি কি মানুষ, না মেষ?" ডাক্তার এমন গালাগালি দিলে যে বনোয়ারীর বিশ্বাস হলো সে বাপ হয়ে গুরুতর অপরাধ করেছে।

শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখভাব সেই ডাক্তারের মুখের মতো। শাশুড়ী বললেন, "আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে; তার এই দশা। আহা, বাছা রে! কেন তোকে আগে আনাইনি!"

বনোয়ারী কাজের মধ্যে ডুব মেরে বাঁচ্‌ল। স্ত্রীকে সে ভালোবাস্‌ত। বিরহে যে দিন দিন মোটা হলো তা নয়। তবু এক রকম শান্তিতে বাস করায় তার ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা দিল। বিরহের সঙ্গে বেশ বনিবনা করে এনেছে এমন সময় স্ত্রী এসে সশরীরে উপস্থিত। বাপের বাড়ীতে তার আর কিসের অধিকার, ভাইদের সংসার হয়েছে, তারাই যা কর্‌বে তাই হবে। ইত্যাদি।

বনোয়ারী চার সন্তানের সহিত তাদের মা'কে দেখে চতুর্গুণ খুশি হলো। তা হোক্‌। কিন্তু আসল কথাটি ভুল্‌ল না। এখন তার চাকরী হয়েছে। শ্বশুরের গলগ্রহ নয়। অম্লান মুখে বলে, "দীক্ষা নিয়েছি। অসিধার ব্রত কর্‌তে হবে।"

ইন্দু তো ফেললে হেসে। ভুরু দিয়ে শাসিয়ে বললে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"

ত্রেতাযুগে একমাত্র লক্ষ্মণ ঐ ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে পেরেছিলেন। কোনো যুগে অন্য কেউ তা পেরেছে বলে পুরাণে উল্লেখ নেই। কাজেই বছর না ঘুরতেই পঞ্চম সন্তানের আগমনের বার্ত্তা এলো। বনোয়ারী এত লজ্জিত হয়ে পড়্‌ল যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পার্‌লে না দিলে তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে।

পঞ্চম সন্তানটি ইন্দুকে বাঁচ্‌তে দিয়ে নিজেই যমের রথে উঠ্‌ল। যাতনায় ও শোকে ইন্দুর চেহারা হলো ইন্দুরের মতো। তার সে লাবণ্য নেই, তার স্বাস্থ্যও গেছে চিরকালের মতো ভেঙে। শ্বশুর রুখে বললেন, "অমন জামাইএর জেল হওয়া উচিত।" শাশুড়ী কপালে কাঁকন হেনে বললেন, "আমার নাতি রে!" বুড়োরা ফোক্‌লা মুখে হাসলেন, "এ কালের ছেলেরা সংযম কাকে বলে জানে না।" বুড়ীরা তুড়ি দিয়ে বলাবলি কর্‌লেন, "নাতির মুখ দেখ্‌তে পাওয়া কলিযুগে ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌ছে।"

বনোয়ারী স্ত্রীকে দেখ্‌তে এসে লজ্জার মাথা খেয়ে বললে, "তুমি বছরখানেক মা'র সঙ্গে কোথাও গিয়ে শরীর সারাও।"

ইন্দু যদিও ইন্দুর হয়েছে, তবু তারও তো একটা অভিমান আছে। সে বললে, "তুমি আরেকটি বিয়ে করো। আমার এ শরীর আর সার্‌বে না।"

বনোয়ারী তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, "যখন তোমাকে চুপি চুপি একটি কথা বলেছিলুম তখন শুনলে তো এমন দুর্দ্দশা হতো না।"

ইন্দু ফোঁস করে উঠ্‌ল।—"আবার সেই বেয়াদবী। মনে রেখো আমি তোমার স্ত্রী। রক্ষিতা নই।"

বনোয়ারী যেন হোঁচট খেয়ে পড়্‌ল।

কয়েক মাস রাঁচিতে কাটিয়ে গায়ে স্বাস্থ্যের জলুস নিয়ে ইন্দু একদিন বনোয়ারীর কর্ম্মস্থলে এলো। বললে, "তোমার কথাই শুন্‌ব। শ্রীরামবাবুর স্ত্রীর কাছে বিস্তর সদুপদেশ পেয়েছি। হাজার হোক্‌ পতি পরম গুরু।"

বনোয়ারী কতটা উৎফুল্ল হলো তা ব্রতচারীমাত্রেই অনুমান করতে পারবেন। বগল বাজিয়ে লাফ দিয়ে বড় বড় কবিদের ভালো ভালো কবিতা ভুল আওড়ালে। বললে, "এত দিনে জান্‌লেম যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম ধন্য রে ধন্য।"

বনোয়ারী যা মনে করেছিল তা নয়। শ্রীরামবাবুর স্ত্রী কোন এক স্বপ্নাদ্য মাদুলী ও সন্ন্যাসীদত্ত ঔষধের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। একদিন ভি-পি'তে সেই সব আপদ এসে হাজির। বনোয়ারী তর্ক করে বললে, "ওসব মনকে চোখ ঠারার সরঞ্জাম। মন ভুললেও দেহ ভুল্‌বে না। বৈজ্ঞানিক সাজ আনাতে হবে।"

ইন্দু বললে, "ও যে কৃত্রিম।"

বনোয়ারী বললে, "ওষুধ বুঝি কৃত্রিম নয়।"

ইন্দু বললে, "ওষুধ হলো গাছ-গাছড়ার থেকে তৈরি।"

বনোয়ারী বললে, "রবারও গাছের রস থেকে প্রস্তুত।"

ইন্দু মাথায় হাত দিয়ে বললে, "ছি, ছি, যে মানুষ বুঝেও বুঝ্‌বে না, তাকে বুঝিয়ে বলা কী ঝকমারী!"

বনোয়ারীও ঠিক্ সেই মন্তব্যই করলে।

স্বামী-স্ত্রীতে মতবিরোধ হলে স্ত্রীর মতই বহাল থাকে। এই হচ্ছে সনাতন বিধি।

যথাকালে ইন্দুর মাথায় উঠ্‌ল ওষুধের বিষ। সে যে একদিন পাগল হয়ে যাবে এর আভাসও দিলে।

বনোয়ারী তাকে এড়াতেই চায়। ইন্দু বলে, "রুগ্ন বৌ মনে ধরবে কেন? আরেকটি বিয়ে করো।"

বনোয়ারী তার মুখে হাত দিয়ে বলে, "পাগল! কী যে বলো—"

ইন্দু হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বলে, "পাগল বৈ কি। বল্‌বেই তো পাগল। পুরানো বৌকে পাগল অপবাদ না দিলে তো নতুন বৌ আন্‌তে পারছ না।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, এ কী সঙ্কট। হে ভগবান, হে আল্লা, হে গড্, তোমরা সকলে মিলে এ হতভাগ্যের একটা গতি করো।

গতি যা হলো তা মামুলি! ষষ্ঠ সন্তান আস্‌ছেন নোটিস্ পাওয়া গেল।

বনোয়ারী বললে, "ঔষধ বিফল বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। তবু ভালো যে হাজারটা টাকা 'পুরস্কার' পাওয়া যাবে।"

ইন্দু বললে, "কী! আমি যাবো সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ কর্‌তে। তুমি স্বামী হয়ে এমন ইঙ্গিত কর্‌লে।"

বনোয়ারী বেচারার ইতিমধ্যে ভুঁড়িটি অন্তর্হিত হয়ে মাথায় টাক পড়েছিল। যেন একটি চর ডুব্‌ল, আরেকটি চর উঠ্‌ল। সে দিশাহারা হয়ে বললে, "বেশ, বেশ। স্ত্রীবুদ্ধি।"

ইন্দু তথাপি ভ্রম স্বীকার কর্‌লে না। বললে, "দেশের জন্যে আমার এই স্বার্থত্যাগ। দেশকে বলবান কর্‌তে হলে তার জনবল বাড়াতে হবে।"

বনোয়ারী বললে, "ঠিক বলেছ। ইংরেজের চেয়ে সংখ্যায় সাতগুণ হয়েও তাদের সমকক্ষ হতে পারা যাচ্ছে না, আটগুণ হয়ে দেখা যাক্ কী হয়।"

"দেখ্‌বে, এইবার স্বরাজ হবে।"

"হ্যাঁ, আরো দলাদলি বাড়্‌বে। পরস্পরের মাথায় বাড়ি দেবার লোক আরো দরকার হবে।"

বনোয়ারীও প্রায় সৌনিক্ হয়ে উঠেছিল।

বৌকে তার বাপের বাড়ীতে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে বনোয়ারী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার শ্বশুর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার স্ত্রী তোমাকে দেখ্‌বার জন্তে পাগল।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, পূরো পাগল হয়েছে তা হলে।—আরো ড়ুশো মাইল দৌড় দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার চাকরী এখনো আছে। তোমার স্ত্রীর ডুঃখ চোখে দেখা যায় না।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। ডুঃখ মিথ্যা। চাকরী মায়া।—আরো তিনশো মাইল পাড়ি দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার ষষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রসূতী ও সন্তান ডু'জনেই নিরাপদ।"

বনোয়ারী তখন পণ্ডিচেরীতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (sixth senseএর) তপস্তায় মগ্ন। ষষ্ঠ সন্তানের সংবাদ তার চক্ষুরিন্দ্রিয় গোচর হলো না।

পুত্রচরিত

১

"আপনার সঙ্গে," ভদ্রলোক ইংরেজীতে সুরু করলেন, "দেখা করবার জন্যে আপনার বাংলোয় যেতে পারিনি, বুড়ো মানুষ। শুনলুম আপনি খাস কামরায় আছেন, তাই—"

"বসুন।" আমি চেয়ার দেখিয়ে দিলুম।

"ইস্! কী ধূলো!" ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লেন, "আপনার উপযুক্ত নয়। আপনাকে আরো ভালো ঘর দেওয়া উচিত।"

আমি ভদ্রলোকের কার্ডখানা আরেকবার পড়ে দেখলুম। হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। মিউনিসিপাল কমিশনার। কার্ডের সঙ্গে ভদ্রলোককে মিলিয়ে দেখতে লাগলুম! বয়স সত্তর হতে পারে! বেশ শক্ত আছেন, তবে চোখে একপ্রকার সজলভাব।

"বিশেষ প্রীত হলুম," তেমনি ইংরেজীতে, "আপনার সঙ্গে দেখা করে। শুধু আপনার নয়, আমার সম্রাটের সকল প্রতিনিধির, সঙ্গে দেখা করে আমি আনন্দ পাই।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরলেন, আবার পকেট হাতড়ালেন।

"পড়ুন কি লিখেছে।" ভদ্রলোক আমার হাতে যা দিলেন তা একটি খাম। এই রকম আরো কয়েকটি খাম তাঁর হাতে রইল। আমার নামের খাম দেখে আমি খুলে পড়লুম।

একখানি মূল্যবান কাগজে দুটি ভাষায় ছাপা সংবাদপত্রের বচন। তার মর্ম, হরিশ্চন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ নন্দন হর্ষবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য সাত বৎসর কাল ইউরোপে বাস ক'রে প্রথমে বার-য়াট-ল এবং পরিশেষে ডি-লিট হয়েছেন। কোথাকার ডি-লিট? প্যারিসের। কী লিখে? "বাংলা সাহিত্যের উপর ল্যাটিন প্রভাব!"

আমার তাক লেগে গেল। আমি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম সংবাদপত্রের অভিনন্দন।

"পড়লেন তো?" ভদ্রলোক সগর্ব্বে বল্লেন, "প্রথমে ইচ্ছা করেছিল প্যারিসে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু আমার পেট্রন সার ল্যান্সলট লয়েড সাহেব তাকে প্যারিস থেকে লণ্ডনে ডাক দিয়ে বল্লেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে করতে চাও কি? চাকরি? ব্যারিষ্টার হয়েও কি চাকরি করা যায় না? সরাসরি ডিষ্ট্রীক্ট জজ করে দেব। হায়রে দুঃখ! এরই মধ্যে নিয়ম বদলে গেছে।"

ভদ্রলোক চশমা খুলে নামিয়ে রাখলেন। "তিন বছরেই ছেলে আমার বার-য়াট-ল। সার ল্যান্সলট স্বয়ং তাকে সার অতুলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এ আমার ফ্রেণ্ডের ছেলে, একে জায়গা জোগাড় করে দিন। তিন বছরে যে পাশ করে ফেলবে, আশ্চর্য্য নয় কি?"

আমার এতক্ষণ পরে মুখ ফুটল। "তা তো বটেই।"

"তার পরেও এক বছর আর্টিকেল হয়ে ছিল বিলেতের এক বড় কৌঁসুলীর কাছে। স্পেশাল ফেভার। সার ল্যান্সলটের দয়া। তারপর দেশে ফিরে আসতে লিখলুম। টাকার শ্রাদ্ধ। কিন্তু ছেলে লিখলো চারশ ব্যারিষ্টার কলকাতায়। তাদের উপর টেক্কা দিতে হলে আরো কিছু শিখে যেতে হয়। আবার গেল প্যারিসে। ফরাসী ও ল্যাটিন বেশ ভাল জানা ছিল। দেড় বছরেই ডি-লিট।"

২

আমার মনে পড়েছিল প্যারিসের সেই দিনগুলি যখন ল্যাটিন কোয়ার্টারে আড্ডা গেড়েছিলুম। হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এক রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে। লম্বা, ষণ্ডা, চোখে প্যাঁস্‌নে চশমা, মুখে সিগরেট। যাকে বলে ম্যান য়্যাবাউট টাউন, সেই রকম হাবভাব। ফরাসীটা তখনো আয়ত্ত করেনি। গোটা গোটা করে বলে।

"আপনি বুঝি এই প্রথম প্যারিসে এসেছেন?" বাতাশারিয়া (Bhattacharya) আমাকে জিজ্ঞাসা করল। "পার্লেভু ফ্রাঁসে!" আমাকে নিরুত্তর দেখে বল্লে,—"আচ্ছা, কোনো ভয় নেই। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।"

প্যারিসে এই দেখানো জিনিষটি নিছক স্বার্থত্যাগ নয়। এর জন্তে আমাকে স্ব অর্থ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

"এসো হে, মশিয়ে সিন্‌হা," মশিয়ে বাতাসারিয়া বল্লে, "আমরা অন্ত রেস্তোরাঁয় যাই। এ শা-রা আমাদের কদর বোঝে না। এদেরকে শা—মজুমদারের দল হাত করেছে। খবরদার, তুমি মজুমদারের দলে মিশো না। ও শা—একটা স্পাই।" আমি ঘাবড়ে গেলুম। চল্লুম দোসরা রেস্তোরাঁয়।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া মাদামোয়াসেলকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় সম্বোধন করলে। "দিদিমণি, সিলভুপ্লে।" পরিবেশিকা এসে দাঁড়ালো। সরলদর্শনা তরুণী। গ্রাহককে খুসী করা তার কর্ত্তব্য। নইলে চাকরি যায়। তাই তাকে হাসতেই হবে। উপায় নেই।

বাতাশারিয়া চায় তার সঙ্গে একটু বাতচিৎ করতে। তা সৈ

রাজি হবে কেন? দু একটা এক তরফা রসিকতার পর বাতাশারিয়া অর্ডার দিল, এটা চাই ওটা চাই। বফ্ রোতি অর্থাৎ রোষ্ট বীফ তার মধ্যে ছিল।

"দিদিমণি," বাতাশারিয়া আমার পানে চেয়ে বল্লে, "একেবারে আমাদের দেশের মেয়ের মত। ওর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। ঐ রাশিয়ান ছি—গুলোর মত নয়।—লীরা মজুমদারকেই চেনে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বফ্ রোতি আনতে বল্লে রাগু দ্য মুতোঁ (ভেড়ার মাংস) নিয়ে আসে। আর ওদের ওখানে ভালো ভ্যাঁ পাবার জো নেই। তবে চা' টা ওদের খাঁটি রাশিয়ান চা!"

আমি গেছলুম লণ্ডন থেকে। প্যারিসের চাল চলনের অশ্লীলতা লণ্ডনে আমাদের অভাব্য। লণ্ডনে কোনো ওয়েট্রেসকে অমন করে ডাকো দেখি। সে একটা সীন বাধাবে। বলবার কিছু থাকে তো তার স্থান কাল কৌশল আছে। আর কী রুচি! ওয়েট্রেসের সঙ্গে প্রেম।

আমি দিব্যি শক্‌ড হলুম। বাতাশারিয়া দত্তকে সম্বোধন করে বল্লে, "কি রে দাতা (Datta) তুই কি বলিস? আমাদের নতুন মক্ষিরাণী পছন্দ হলো?"

বাতাশারিয়া লণ্ডনে কখনো এমন চীৎকার করে কথা বলতে সাহস করত না। আর এই সব কথা! দত্ত ছেলেটি ভিজেবেড়াল। চোখ টিপে তাকে হুঁশিয়ার করে দিলে আমার সম্বন্ধে। যেন আমি তাদের বাড়ীতে চিঠি লিখে জানাতে যাচ্ছি।

"আরে যাঃ। সব শা—কে চিনি।" বাতাশারিয়া বেপরোয়াভাবে বল্লে। "তোমরা লণ্ডনওয়ালারা কম সয়তান নও। আমি যাচ্ছি লণ্ডনে। রোঁসোঁ। আগে প্যারিসের পথ ঘাট চিনি।"

তারপর সেই মেয়েটিকে বাংলায় বল্লে, "দিদিমণি, আমার কোলে শোবে? কেন লজ্জা কিসের?"

মেয়েটি একবিন্দুও বুঝতে পারলে না। ভাবলে কিছু একটা হাসির কথা হবে। গ্রাহককে সন্তুষ্ট করবার কড়া হুকুম আছে। কোনো গ্রাহক যদি মিথ্যা করেও তার নামে অভিযোগ করে তবু পাত্রঁ (মালিক) তাকে ছাড়িয়ে দেবে, যদি না সে মালিকের প্যারী হয়ে থাকে। রেস্তোরাঁর চাকরি এক মজার চাকরি। মাইনে নেই। আছে খোরাকি। আর গ্রাহকদের বখশিষ। বখশিষেরও ষোলো আনা নেবার যো নেই। বখরা করতে হয় সর্দ্দার বা সর্দ্দারনীর সাথে।

মেয়েটি মুচকি হাসলে। তা দেখে বাতাশারিয়া হো হো করে হেসে উঠল। যেন কত বড় তামাসা করেছে। দত্ত আমার দিকে চুরি করে চেয়ে রেগে উঠল। আমি ঘেমে উঠলুম। এ অত্যাচারের শাসন নেই। ফরাসী রেস্তোরাঁ হৈ হৈ ব্যাপার। কতগুলো ভিখিরী এক কোণায় দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বাজাতে কখন সুরু করে দিয়েছে। অন্যান্য টেবলেও হট্টগোল। সবাই সমান বাচাল।

দুটি একটি করে বাতাশারিয়ার দলের যুবকরা এসে জুটতে লাগল। তাদের কেউ বাঙ্গালী কেউ গুজরাটী, কেউ পাঞ্জাবী। তাদের কারুর কারুর সঙ্গে নায়িকা ছিল। বাতাশারিয়া উঠে গিয়ে তাদের টেবলে খানিক বসে নায়িকাদের সঙ্গে দুটো ফরাসী কথা কয়ে আসে। বেশ, বেশ, তোমরা আমাদের দলে। বড় সুখের বিষয়। এই তার প্রধান বক্তব্য। তা বলে সে তামাসাও কম করে না। যাদের নায়িকা তারা কি মনে করলে বাতাশারিয়া তা গ্রাহ্য করে না। গায়ে তার গুণ্ডার জোর। কে তার সাথে লড়তে যাবে। তার চেহারা থেকে অনুমান হয় সে একটা গোঁয়ার গোবিন্দ।

"বাহবা ক্লোদিন," সে বলে একটি মেয়েকে, "তুমি নাকি বিয়ে করছ আঁরি কে।" তার ভাবী স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, "আঁরি, তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমাকে আর পয়সা খরচ করতে হবে না।"

ওরা দুজনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ছেলেটি বোধ হয় আর্টিষ্ট। অন্য কিছু হলে রেগে লাল হত। আর মেয়েটি বড় ভালো জাতের। আমি ওদের সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হলুম। হাজার হোক ওরা ফরাসী। দেশ ওদের। ইচ্ছা করলে কি ওরা শিক্ষার বন্দোবস্ত করত না আমাদের ইঞ্জিনিয়ার দাদার ?

পরদিন আমি ওর সংশ্রব এড়াবার জন্যে অন্যত্র খেলুম। বিশেষ কোনোখানে না, যেখানে খুসী। তবে আমার প্রিয় ছিল একটা পাতিসেরি। সেখানে পেট ভরে পিঠে খেতুম। আর কন্টিনেণ্টাল ডেলী মেল কিনে পড়তুম। আমি আগে জানতুম না যে মজুমদার তাঁর দলের হাত থেকে পালিয়ে এসে নিরিবিলিতে সেইখানে ক্লাসের পড়া তৈরি করতেন।• এক আশ্চর্য্য মানুষ এই মজুমদার। সন্ধ্যাবেলায় যে তাঁকে দেখে সে ঠাওরায় লোকটা আমোদপ্রমোদ নিয়েই আছে। অসাধারণ আড্ডা-বাজ। কিন্তু নিজের কাজটি বেশ গুছিয়ে নিতে জানেন। ফরাসী ভাষা দুরস্ত করে ডাক্তারী পড়ছেন মন দিয়ে। সুপুরুষ। নাচতেও পারেন ভালো। মেয়েরা যদি তাঁকে ঘেরাও করে তবে সেটা কি তাঁর অপরাধ ? প্যারিসের ভারতীয় ছাত্ররা মিলে একটা সমিতি করেছিল, তার উদ্যোক্তা ছিলেন মজুমদার। বাড়ীওয়ালা তাঁকে বিশ্বাস করে ভাড়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না, দোকানদারেরা তাঁর খাতিরে বাকী ফেলে রাখত। বণিক শ্রেণীর ভারতীয়দের• কাছ থেকে চাঁদাও তুলেছিলেন তিনি ঢের। তবু তাঁর প্রতিপক্ষরা বলে, সমিতিতে তিনি মেয়েদের আসতে দেন, এ এক গুরুতর অপরাধ।

বাতাশারিয়া দল পাকিয়ে সমিতি ক্যাপচার করলে। তারপর মজুমদারের নামে রটালে তিনি অনেক টাকা খেয়েছেন, হিসাব দেননি। মজুমদারের বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে সমিতি থেকে বেরিয়ে গেল। তার ফলে পাওনাদারেরা সমিতিকে ছেঁকে ধরলে। বাতাশারিয়ার দল রাতারাতি সমিতির নাম বদলে বাড়ী বদলে মজুমদারের কীর্ত্তি লোপ করলে।

"কি মিঃ সিনহা," মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে যে। বাতাশারিয় আপনাকে আসতে দিলে।"

"মিঃ মজুমদার," আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, "আমি সাবালক।"

লক্ষ্য করলুম মজুমদারকে খুঁজতে সেখানেও মেয়েরা আনাগোনা করে। ভাগ্যবান পুরুষ। বাতাশারিয়া যে হিংসা করবে তার আশ্চর্য্য কি। আমারি হিংসা করতে প্রবৃত্তি হয়। তবে এদের এই নিয়ে দলাদলি আমার বিশ্রী লাগে। লণ্ডনে আমাদের দলাদলি পলিটিকল। আমরা কেউ কমিউনিষ্ট, কেউ সোশ্যালিষ্ট, কেউ ন্যাশনালিষ্ট, কেউ মডারেট। কিন্তু প্যারিসের ভারতীয়দের দলাদলি নারীঘটিত। কার কটি নায়িকা আছে এই তাদের গণনা।

আমি বোধ হয় কতকটা হতাশ হয়ে প্যারিস ছাড়লুম। আমার একটিও বন্ধুনী মিলল না। সকলে আমাকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখল।

৩

মাস ছয়েক পরে আবার প্যারিসে গেলুম। এবার থাকার জন্যে নয়। প্যারিস আমার পথে পড়ে। তাই নামলুম। ল্যাটিন কোয়ার্টারের উপর অশ্রদ্ধা ধরে গেছল। উঠলুম লিঁয় ষ্টেশনের অনতিদূরে। আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলুম গুহ ঠাকুরতাকে। সে এলো।

প্যারিসের কে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। সেই সূত্রে উঠল বাতাশারিয়ার কথা।

"তার কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে ব্যথা দিলে সিন্‌হা," বল্লে গুহ ঠাকুরতা। লোকটি নরম স্বভাবের। পড়াশুনা নিয়ে থাকে। স্ত্রীজাতির ছায়া মাড়ায় না। প্যারিসে এমন ছাত্রও যে মেলে অন্তত আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে গুহ ঠাকুরতাকে না চিনলে আমি বিশ্বাস করতুম না। সেই গুহ ঠাকুরতা আমাকে করুণ কণ্ঠে বল্লে, "বাতাশারিয়া আমাকে খুন করতে বাকী রেখেছে সিন্‌হা।"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। মিথ্যা বলবার পাত্র নয় গুহ ঠাকুরতা। তার চোখ ছলছল করছে।

"আমার পক্ষপাত মজুমদারের প্রতি। তা বলে আমি যে মজুমদারের দলের তা নয়। আমি কোনো দলের নই।"

"যার বন্ধুনী নেই তার দল থাকবে কি করে?" আমি হেসে বল্লুম।

"যাও," গুহ ঠাকুরতাও হাসল। "একদিন মজুমদার এসেছেন আমার হোটেলে, আমার ঘরে। আমি তাঁকে এক পেয়ালা শোকোলা করে খাওয়াতে যাচ্ছি। এমন সময় বাতাশারিয়া, দত্ত, ঘোষ, হাজরা, জামিয়াৎ সিং, দিনশাজি ইত্যাদি এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুল্ল। কি হয়েছে। আমরা মজুমদারকে চাই, ছেড়ে দাও। আমি বল্লুম আমার ঘরে আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা ঢুকলে কেন। ওরা আমাকে পা দিয়ে হটিয়ে দিয়ে অশ্লীল ভাষায় জবাব দিলে। মজুমদারের গায়ে হাত দিতেই আমি বলে উঠলুম উনি আমার অতিথি। ওরা আরেকটা অশ্লীল বাক্য বলে আমাকে রাগিয়ে তুল্লে। তখন আমি বেল টিপলুম। ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাতে মোচড় দিলে। মজুমদার ইতিমধ্যে কুস্তি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুস্তিতে না পেরে ওরা আমার

ঘরের আসবাবপত্র একে একে ছুঁড়ে মারতে থাকল। ঘা লেগে জানালার কাচ গেল ভেঙে। আরো লোকসান হত। কিন্তু লোকজন এসে পড়ল। তখন তারা শাসাতে শাসাতে বেরিয়ে গেল।

"কিন্তু কেন হঠাৎ এ অভিযান?" আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম প্যারিসের ছাত্রদের নীচতার বিবৃতি শুনে। লণ্ডনের স্লামেও ছোটলোকেরা এমন হাঙ্গামা বাধায় না, ভারতীয় ছাত্ররা তো ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মত বাস করে।

"সেই যে পাতিসেরীতে তুমি খেতে মনে পড়ে?"

"খুব মনে পড়ে।"

"সেখানে একটি মার্কিন মেয়ে খেত মনে পড়ে।"

"মনে পড়ে বৈকি।"

"মিস হিলটন মজুমদারকে বিশ্বাস করে একশ ফ্রাঁ রাখতে দিয়েছিল। সামান্য একশ ফ্রাঁ। বাতাশারিয়ারা গন্ধ পেয়ে তাকে বলেছে, মজুমদার তহবিল তসরুপ করেছে। ওকে বিশ্বাস কোরো না, ওর কাছ থেকে টাকাটা বের করে আমাদের জিম্মা দাও। আমরা তোমার হিতৈষী। সে বড় বোকা মেয়ে। যে যা বোঝায় তাই বোঝে। মজুমদারকে চাইলে টাকা। মজুমদার জেরা করে জানলে বাতাশারিয়ার কারসাজি। বল্লে, তুমি তোমার হিতৈষীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"ওঃ কী ইতরতা!" আমি উচ্চস্বরে বল্লুম। মার্কিন মেয়ের কাছে দেশের লোকের সুনাম নষ্ট করে। তাতে যে দেশেরই সুনাম নষ্ট। ছি ছি সামান্য একশ ফ্রাঁ, যার দাম গোটা এগারো বারো টাকা। মার্কিনীদের পক্ষে যা একবেলার খোরাক।"

"কিন্তু তাই শেষ নয়, সিন্‌হা। বাতাশারিয়া দেশের লোকের মুখে আরো চুনকালি মাখিয়েছে।"

গুহ ঠাকুরতা এর পরে যা বল্লে তা আরো রোমহর্ষক। তা নিয়ে আরেকখান হর্ষচরিত্ত গ্রথন করা যায়। সংক্ষেপে এই—

সেই যে দিদিমণি তাকে শেষপর্য্যন্ত বাতাশারিয়া কায়দা করলে। মেয়েটি খাস প্যারিসের নয়, মফঃস্বলের। আত্মরক্ষার পদ্ধতি তেমন রপ্ত করেনি বলেই মনে হয়। নন্দনের আগমন সূচনা পেয়ে হর্ষবর্দ্ধনের ক্রন্দন। সে বল্লে, হতভাগী তোকে এত যত্নে জন্মসংযম শেখালুম। তোর মত এমন অসংযত মেয়ে তো দেখিনি। বামুনের ছেলে আমি। তোকে বিয়ে করে জাত দেব?"

কোন এক হাতুড়ের কাছ থেকে দাওয়াই এনে ওকে খাওয়ালে। ফলে ওর মরণাপন্ন অবস্থা। তখন খেয়াল হলো যে মজুমদার ডাক্তারী পড়ে। সে যদি দয়া না করে তবে অন্য ডাক্তার এসে বাতাশারিয়াকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। মজুমদারের কাছে সোজা না গিয়ে গুহ ঠাকুরতাকে সাধলে মজুমদারের কাছে নিয়ে যেতে। হাজার হোক দেশের লোক। বিদেশে বিপাকে পড়েছে। মজুমদার বল্লে, কাজটা বেআইনী। জেলে যেতে চাইনে। তখন গুহ ঠাকুরতা সারা প্যারিস চুড়ে চোরের মত কত ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে অবশেষে একজনকে পটালে। গুহ ঠাকুরতার সেবায় মেয়েটা প্রাণে বাঁচলে।

কিন্তু ডাক্তারের বিল মেটাবার সময় বাতাশারিয়া বল্লে, "আমার কাছে টাকা কোথায় ঠাকুরদা! আর বিল কি সোজা বিল? না ডাক্তার ভেবেছে আমি লক্ষপতি। না বাবা, এখনো লক্ষনারীর পতি কিংবা উপপতি হইনি।"

অগত্যা গুহঠাকুরতাকে একরকম সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে।

আমি বল্লুম, "বেশ হয়েছে। অপাত্রে দয়া করলে সে দয়া পাপ, সে পাপের সাজা আছে।" কিন্তু আমার পক্ষে ওকথা বলা সোজা। আমি

তো গুহ ঠাকুরতার মত হৃদয়বান নই। আমি হৃদয়বত্তার নামও দিই নি। গুহ ঠাকুরতাকে সান্ত্বনা দিতে একটা মামুলি কথা বল্লুম, "যাক, ভগবান আছেন।"

৪

দেশে ফিরে এই কয়েক বছরে ওসব ভুলে গেছলুম। আজ হরিশবাবু দেখা করতে এসে মনে পড়িয়ে দিলেন।

"আমি চিনি আপনার ছেলেকে।"

"চেনেন? শুনে সুখী হলুম। বাবা আমার সম্প্রতি রওয়ানা হয়েছে। সামনের মাসে পৌঁছবে। দীর্ঘ সাত বছর পরে। বার-য়্যাট-ল। ডি-লিট। দেশের গৌরব, দশের একজন।"

গুহ ঠাকুরতার কি হলো জানিনে।

(১৯৩৩)

---

১৭১ হেনরিয়েটা রোড

১

বাংলার বাইরে যদি কোথাও বাংলা থাকে তবে সে ১৭১ হেনরিয়েটা রোড, লণ্ডন, এন ডব্লিউ ফোর। বাড়ীটা এডওয়ার্ডীয় যুগের। যুদ্ধের পর এক আইরিশ বাড়ীওয়ালীর হাতে আসে। বাইরে থেকে দেখতে জমকালো, যদিও ভিতরে অত্যাধুনিক স্যানিটারি বন্দোবস্তের অভাব। সে অভাব না থাকলে বাঙালীর ভাগ্যে এমন বাড়ী জুটত না, বাড়ীওয়ালী অসম্ভব দর হাঁকত। বাঙালী যে কবে প্রথম এ বাড়ীতে উপনিবেশ স্থাপন করলে তার ইতিহাস অদ্যাপি অলিখিত। কিন্তু বাঙালীরা এখানে অন্য জাতের লোককে ভিড়তে দেয় না।

এ বাড়ীর অনেক সুবিধা। এখানে তুমি ডাল ভাত খাও, ধুতি পাঞ্জাবী পর, বাংলায় কথা বল—

আমি যখন দেশে ফিরি তখন অন্যান্য উদ্‌ভট প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটিও শুনেছিলুম, "আচ্ছা, আপনারা কি ওদেশে নিজেদের মধ্যে বাংলাতে কথা বলতেন ?"

হাঁ, ১৭১ হেনরিয়েটায় বাংলা—বিশুদ্ধ বাংলা—কথা বল, কর বাংলা গান, কেউ তেড়ে আসবে না। বাড়ীওয়ালীর বিপুল বপু। তার নাম দেওয়া যেতে পারে বপুমতী। বেচারী বেস্‌মেণ্ট থেকে উপরে উঠতে পারে না বলে' সেইখানেই বাস করে। তার হয়ে খবরদারী করে তার ষোড়শী কন্যা নোরা। ষোড়শী, কিন্তু ইতিমধ্যেই আড়াই মণ। তা হোক মেয়েটি লক্ষ্মী। এত লক্ষ্মী যে সরস্বতীর সঙ্গে তার আজন্ম শত্রুতা।

সবাই তাকে স্নেহ করে। জাহাজে বা সৈন্যদলে যেমন একটি বেড়াল বা বেঁজি থাকে, যাকে বলে ম্যাস্‌কট্, এ বাড়ীতে নোরা হচ্ছে তাই।

"নোরা," কেউ যদি তাকে ডাকে সে বলে, "যাই।" ঐরকম দু' চারটে বাংলা বুলিও শিখে নিয়েছে।

মেয়েটি সকলের প্রতি যত্নবতী সকলের ফাই-ফরমাস খাটে। কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে সামন্তের সম্ভবপর বধূ। সামন্ত অর্থাৎ আশুতোষ সামন্ত এ বাড়ীর রাজা। নামে আশুতোষ গুণেও তাই। যেমন আমুদে তেমনি দরদী। পড়াশুনা নামমাত্র করে, মাঝে মাঝে ফরাসী ছুটি নিয়ে বাসায় পড়ে' পড়ে' ঘুময়। সেও একরকম পড়া। কিন্তু কারুর কোনো বিপদ আপদ ঘটলে সব আগে ছুটে যায় সামন্ত। পকেট খালি। থাকে বাড়ীওয়ালীর কৃপায়। রোজ বলে এই মাসেই তোমার পাওনাটা চুকিয়ে দেব, মিসেস ওমালি। বাড়ীওয়ালী বোঝে যে বেচারার আত্মসম্মানবোধ ওতে পরিতৃপ্ত হয়। মনে মনে হাসে। সামন্ত যে তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে এটা সেও কল্পনা করে' সুখ পায়। বিয়ে করে' কিন্তু দেশে নিয়ে যেতে পাবে না। একমাত্র মেয়ে। মেয়ের মাও এমন নয় যে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবে। তাকে জাহাজে তুলতে ক্রেনের দরকার হবে। ওজনে অন্তত পাঁচ মণ।

সামন্ত ছাড়া এ বাড়ীতে যে কয়জন স্থায়ী অতিথি তাদের নাম পরিচয় নিম্নলিখিত বিধ :—

হেরম্ব নাথ চাকী। ইনি প্রবীণকল্প ব্যক্তি। কিন্তু গানে—বিশেষ হাসির গানে—লণ্ডনের বাঙালী সম্প্রদায়ের তানসেন। কারুর সাতেও না পাঁচেও না। নিজের রিসার্চ নিয়ে জোর পরিশ্রম করেন। কেবল মাঝে মাঝে জলসায় কান ঝলসান।

দুলাল দাশগুপ্ত। ইনি প্রত্যেক বছর আই-সি-এস দেন। সাঁরা

বছর চব্বিশ ঘণ্টা ঘর থেকে আঙিনায় ও আঙিনা থেকে ঘরে ঠাঁই বদল করেন। সর্ব্বদা মুখ ভার। কিছু হচ্ছে না পড়াশুনা। কেন হচ্ছে না? এমনি। মন লাগছে না। মন কিসে লাগছে? কিছুতে না। কেবল ঘটা করে' চুলে ব্রিলিয়ান্টিন মাখেন। গায়ে মাখেন যত রাজ্যের সাবান পাউডার স্নো। পুষিমেনির মত সেজে গুজে থাকেন দামী ইংরাজী পোষাকে। কার তরে এত সজ্জা? কারুর তরে নয়। সেইখানেই তো ট্রাজেডি।

এঁরা এ বাড়ীতে স্থিতিবান রায়ৎ। কি জানি কবে থেকে আছেন। এঁরা ছাড়া অন্য দু' একজন থাকেন। তাঁরা ঋতু অনুসারে বদলান। ১৭১ হেনরিয়েটা রোড বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে এই তিনজন। আর এঁদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাঁরা আসেন তাঁরা। তাঁদের সংখ্যা অগুনতি। বলা বাহুল্য আমিও একজন।

যখন যাই দেখি দুলাল পায়ের উপর পা রেখে একখানা বই কোলে নিয়ে একটু ঘুমচ্ছেন। "না, ঘুমচ্ছি না, এই চিন্তা করছি, হলো কি! বৃথা কেটে যায় বর্ষ কেন!"

"আসুন, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।"

"না, ভাল লাগে না। আচ্ছা সিন্‌হা, আপনি কি করে' জীবনে এত রস পান। কিছু পান করেন কি?"

আমি হাসি। বলি, "আপনি অন্তত প্রেমরস পান করুন।"

"নাঃ। ভাল লাগে না।"

সামন্তকে দেখি নোরার কোলে পা তুলে দিয়ে বোম ভোলানাথের মত বসে আছে। নোরা পরিয়ে দিচ্ছে জুতো। ব্রাশ দিয়ে চকচকে করে' দিচ্ছে। সামন্ত হাই তুলে বলছে, "হাঃ। যেতে হবে ক্লাসে। এই করতে করতে বয়স চলে গেল।"

"টাক পড়ে গেল মাথায়।"

"কে হে তুমি আমার কাছে ফুটানি করছ।" সামন্ত বলে ঢাকাই টান দিয়ে।

ওর সমস্ত কৌতুককর, শুধু এইটুকু নয়। ও বিনা আয়াসে হাসায়। বেশ গম্ভীর ভাবে হাসায়। লোকটা কাউকে কেয়ার করে না। কোথাও রাস্তার মাঝখানে ভিড় জমেছে—সামন্ত জানতে চায় কি ব্যাপার। অমনি মোড়লের মত পকেট থেকে নোটবুক বের করে' কি যেন টুকতে স্নুরু করে' দিলে। টুকছে তো টুকছেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করছে, "আপনার নাম?" আরেকজনকে, "আপনার কি মত?" ওরা ঠাওরায় খবরের কাগজের রিপোর্টার হবে। বলাবলি করে, "এই, পথ ছেড়ে দাও। দেখছ না ইনি কি লিখছেন?"

এমনি মজার মানুষ সামন্ত।

গম্ভীরভাবে এমন সব আজগুবি কাহিনী বানিয়ে বলে যে শুনে রোমাঞ্চ বোধ হয়, হাসিও আসে। সামন্ত বলে, "হাসির বিষয় নয়। আমার অভিজ্ঞতা। ভাববার বিষয়। দেশ বলে আপনারা যাকে বলেন, যেখানে ফিরে যাবেন বলে' তৈরি হচ্ছেন, সেখানকার মানুষের দস্তর ঐ। সারারাত কীর্তন গায়, কবে আমার সুদিন হবে, নাড়া মুড়া মিশে যাবে।"

হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা হয় অন্যত্র কোনো গানের আসরে। ১৭১ নম্বরে তিনি রাত করে' ফেরেন। সেখানে কি হয়, কি না হয়, কে যায়, কে না যায় সেসব খবর রাখেন না। নোরার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক কম। কিন্তু যে কেউ ১৭১ নম্বরে গেছে সে প্রথম দিনেই নোরাকে স্নেহের চোখে দেখেছে, বার বার গেছে নোরার মিষ্টি কথা ও মিষ্টি সুর শুনতে। অমন মেয়ে দুর্লভ। বুদ্ধিশুদ্ধির ধার ধারে না। কোনো একখানা বই দিয়ে বল, পড় দেখি নোরা। সে দুই কাঁধ তুলে বলবে,

না। সে লজ্জিত নয় তার নিরক্ষরতার দরুণ। তার এত কাজ সময় কখন লেখাপড়া করবার। তবে খুব মন দিয়ে শোনে কি লোচনা হচ্ছে। কেউ যদি বলে, তুমিই বল না নোরা বড়লোকদের ত্যুর পরে তাদের সম্পত্তির উপর ডেথ ডিউটি বসানো কি ন্যায়সঙ্গত? নোরা চুপ করে' সরে যায়। যেন ওকে মূর্খ বলে' উপহাস করা হলো।

এরূপ স্থলে সামন্ত প্রাণপণে নোরার মান পাহারা দেয়। কেউ যদি নোরার প্রতি অবজ্ঞা সূচক একটি কথা বলেছে অমনি সামন্ত রুখে বলে,

"মুখ সামলাইয়া কথা কহেন মশয়।"

আমিও বেফাঁস কিছু বলে' সামন্তর বকুনি খেয়েছি। "বাজে কথা কও ক্যান।"

"আমাকে বলছ?"

"হ হ। কুবাইক্য কহন ভাল নয়। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়নি?"

মোট কথা সামন্ত কাউকে রেহাই দেয় না। নোরা ল্যাণ্ডলেডির ডটার বলে' তাকে আমরা সংক্ষেপে এল এল ডি বলতে পারব না। তাকে নোরা বলে' ডাকলেও সামন্ত মনে মনে চটবে। বলতে হবে মিস্ ওমালি। ওরা হচ্ছে উচ্চ বংশের লোক। গরীব হয়ে পড়েছে সংসারচক্রের আবর্ত্তনে। আবার উঠবে।

সামন্ত নোরাকে আদর করে না, তাকে হিন্দু বালিকার মত খাটিয়ে নেয়। কড়া কথা বলে। স্বামী হলে সে অতি জবরদস্ত স্বামী হবে। স্ত্রৈণ হবে না। কিন্তু স্বামী যে সে হবে কার সাধ্য এ নিয়ে তাকে কিছু বলে। এমন ভাব দেখায় যেন সে নোরার জ্যেঠামশায়।

"না, না। ঠাট্টার বিষয় নয়। বিয়ে হলো ভগবানের হাত।"

"তা কি জানি নে! ওটা এখনো ট্রান্সফার্ড সাবজেক্ট হয়নি।"

"তবে ক্যান বাজে কথা কও। যদি বিয়ে না হয়।"

"না হয় নাই হলো।"

"তবে? তবে ক্যান মেয়েটার মাথা খারাপ কইরা দাও?"

কিন্তু মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েই রয়েছে। সে যখন সামন্তর টাকের উপর ম্যাকাসার অয়েল মাখিয়ে দেয় কিংবা তার জন্যে বিশেষ কিছু রাঁধে তখন আমি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি কি প্রগাঢ় ভক্তি তার মুখভাবে। বালিকা বধূর সঙ্গে তার এমন কি প্রভেদ? সে যেন মনে মনে জপ করছে, স্বামীর জন্যে। আমার স্বামীর জন্যে।

অন্যের বেলায় সে মা কিংবা বোন। সামন্তের বেলায় সে বধূ।

একদা আমার প্রিয় বন্ধু বোস ও বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বোসকে দেখতে গিয়ে দেখি নোরা তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। শুনলুম রাত্রেও নাকি সে বোসকে ছেড়ে ঘুমতে যায় না। বোস কৃতজ্ঞভাবে বল্লে,

"ও আমার কতকালের বোন।"

কিন্তু সবাই তো গোপেন্দ্র বোস নয়, পৃথিবীতে সরীসৃপ শিকদারও আছে। পরে বলব ওর কথা। চাকী আমাকে তখনি বলেছিলেন একান্তে,

"তোমার বন্ধু একটা কুদৃষ্টান্ত দেখালেন। ছোট ছেলের মত অধৈর্য্য হয়ে কেবল নোরা নোরা বলে' ডাকলে নোরা কি সাড়া না দিয়ে পারে?"

২

সকল সমবয়সিনী মেয়ের মত নোরারও নানা অভিলাষ ছিল। সামন্ত তাকে নিয়ম করে' বায়োস্কোপে নিয়ে যায়। ভাবে এই তার

পক্ষে যথেষ্ট বিনোদন। আমি খুব বড় লোক হবার প্রত্যাশা রাখি না। আমার স্ত্রীকে এই বয়স থেকে এমন করে' তালিম করব যাতে সে এর বেশী বাবুয়ানা না করে। দিস ইস দি লিমিট।

নোরারও সেই ধারণা। সামন্ত যা উপভোগ করে তাই তার উপভোগ্য, তা ছাড়া আর সব বিষ। সামন্ত নিজে একজন ছবিখোর। নোরাকে ছবি দেখতে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে নোরার সঙ্গ ছাড়া অন্য কারণেও উল্লাসকর।

সামন্তের ওখানে আড্ডা দিতে যারা আসত তাদের দলে কেমন করে' এক ইটালিয়ান ছোকরা আমদানি হলো। ইটালিয়ানরা বোধ হয় প্রত্যেকে এক একটি দানুন্ত্সিও। নারী দেখলে তারা মনে মনে বাজি রাখে, একে যদি শিকার না করতে পারি তবে আমি কিসের পুং নর। যতই বেঁটে খাটো ময়লা কুঁড়ে হোক নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা এক একটি উদ্যোগী পুরুষসিংহ। এই ছোকরাটিও একটি বাচ্চা কামদেব। নোরাকে বল্লে,

"নাচবে?"

নাচে না এমন মেয়ে ইউরোপে নেই। নোরা কিন্তু সামন্তর কন্নবধূ হয়ে অবধি নাচেনি। কবে ছেলেবয়সে নাচত, তারপর সুযোগ না পেয়ে ভুলে গেছে। নাচলে হয়ত এত মোটা হত না। কিন্তু সামন্ত বলে, নাচ আমার দেশে নষ্ট মেয়েমানুষদের পেশা। নোরা শিউরে ওঠে। সে নাচতে চাইবে কোন্ সাহসে! সামন্ত কি তা হলে তাকে বিয়ে করবে! তাই এত কাল নোরা চুপ করেই ছিল।

যেই যোভানি প্রস্তাব করলে "নাচবে?" অমনি নোরার মনে হলো জীবনটা ব্যর্থ গেল, না নেচে। সে খানিকটা চোখের জল ঝরালে। মাকে বল্লে, "যোভানি বলছে ডান্স হলে নিয়ে যেতে।" মা বল্লে,

"মিষ্টার সামন্ত কি বলেন? ডাক তাঁকে।" সামন্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। হায়! এত দীর্ঘকাল ধরে' তালিম দেওয়ার পরে তাকে এমন কথা শুনতে হলো আজ! কুকুরের ল্যাজ কি সোজা হতে পারে! বৃথা পরিশ্রম। ইউরোপ কখনো হিন্দু হবে না। বিয়ে করতেই হবে একটা পাঁচি কিংবা খেঁদিকে। তা ছাড়া পন্থা নেই।

সামন্ত বল্লে, "নাচুক, তবে শুধু আজ কেন, সারা জীবন যোভানির সঙ্গে।"

মা মেয়েকে চোক টিপে ইসারায় বোঝালে, দেখলি তো। আসল মানুষের মত নেই।

নোরা অত্যন্ত নিরাশ হলো। তার বয়সের সবাই নাচছে। সেই নাচতে পারবে না। পর পুরুষে এতই যদি আপত্তি তবে সামন্ত স্বয়ং আসুন না নৃত্যাগারে। সে মুখ ফুটে বল্লে একথা সামন্তকে। সামন্ত উগ্র মূর্তি ধরে' উত্তর দিলে, "কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমি কি বেহায়া যে সকলের সাক্ষাতে মেয়েলোক নিয়ে নাচ্‌ব!

পরদিন যোভানি সামন্ত যখন বাসায় থাকে না এমন সময় নোরাকে ফোনে ডাকলে। সে অনেক মেয়েকে মজিয়েছে। নোরা তো একটা বোকা হাতী।

নীচের তলার আস্তানা করলে কি হয় মিসেস ওমালির শ্রবণশক্তি প্রখর। সে মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে,

"ফোন করছিল কে?"

নোরা নিরুত্তর। মা তেতে উঠে বল্লে, "ধাড়ি মেয়ে। যোভানির সঙ্গে পিরীত করবার সখ। যোভানি কি দায়ে ঠেকলে বিয়ে করবে! ফুড়ুৎ করে' উড়ে যাবে দেখিস। সামন্তর মত বিশ্বাসী কেউ নয়। ভারতীয়রা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য। দেখ দেখি কেমন নারী বর্জিত

জীবন এদের। যেমন সামন্ত তেমনি চাকী তেমনি দাশগুপ্ত। ইংরেজ কি ফরাসী হলে এমন জীবনের চেয়ে মরণ শ্রেয় মনে করত।”

৩

আমি কয়েক হপ্তা লণ্ডনে ছিলুম না। ফিরে দেখি ১৭১ নম্বরে একটি নতুন অতিথি উপনীত। বয়স কম। যোভানির মত হাবভাব। গায়ের রং মিশ কালো, কিন্তু চেহারায় ‘ইট্’ আছে। ওকে কেমনতর ভীষণ দেখায়। ও যেন মানুষ নয়, সরীসৃপ। ওর যেন হৃদয় নেই। আছে ক্ষমতা। খেলায় ধূলায় পটু, গাইতেও পারে মন্দ না। বাজাতে জানে বাঁশি।

এমন সব্যসাচীর তুলনায় কি আছে সামন্তর? টেকো সামন্ত যত বয়স্ক নয় তার অধিক বয়স্ক বলে’ ভ্রম জাগায়। যৌবনে প্রৌঢ়। তাকে স্বামী ভেবে শ্রদ্ধা করা, তার বিচারের প্রতি আস্থা রাখা, কিশোরী মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে মন মাতানো কি আছে? আর সরীসৃপ শিকদার এক রাশ কালো কুঞ্চিত কেশের অধীশ্বর। তার চামড়া কেমন মসৃণ, তার চোখ কেমন জলজলে, তার জুলপি কেমন লিকলিকে, কেমন ঢেউ খেলে যায় তার ভুরুতে। সুগঠিত সবল দেহ। সুচতুর বাক্যালাপ। ধূর্ত্ত দৃষ্টিক্ষেপ।

সরীসৃপ সামন্তকে চাকীকে দাসগুপ্তকে প্রথম অবস্থায় ভারি আপ্যায়িত করলে। কাউকে সন্দেহ করতে দিলে না কি তার লক্ষ্য। সবাই সরীসৃপের উপর প্রসন্ন। ছেলেমানুষ এত কম বয়সে মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে। সামন্ত মিসেস ওমালির কাছে খুব একচোট সুপারিশ করলে সরীসৃপকে। নোরাকে ধমক দিয়ে বল্লে,

"শিকদারের জন্যে খিচুড়ি রঁাধতে পার না কেন? ও যে ভুনি খিচুড়ি বড্ড ভালবাসে।"

যোড়শোপচারে শিকদার-জয়ন্তী চাক্ষুষ করে' আমি তো ধন্য হয়ে গেলুম। কিন্তু শিকদারের কথোপকথন আমার সহ্য হলো না। বাপের পয়সায় বিলেত এসেই এমনি ভুঁইফোড় কমিউনিষ্ট। "আমরা বিশ্বের চির বঞ্চিত সম্প্রদায়, আমরা কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্ট ভাগ করে' খাই। আমাদের ব্যথা আপনি কি বুঝবেন, মিস্টার সিন্‌হা? কি বলেন সামন্তদা?"

সামন্ত ঘাড় নেড়ে তারিফ করে। উল্লুক।

"বেদনায় ভরে গিয়াছে পেয়ালা। হায় রে! শ্রমিকের আঁশু কেউ মুছায় না। শ্রমিকের লহু সবাই চোষে।

আমার গা জ্বালা করে ঈদৃশ ন্যাকামির সাক্ষী ও শ্রোতা হলে। আমি ১৭১ নম্বরে যাতায়াত থামালুম।

৪

হঠাৎ একদিন খবর পেলুম, সামন্ত ও বাড়ী থেকে উঠে এসেছে। বিশ্বাস হলো না। সামন্ত ও বাড়ীর সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত যে ১৭১ নম্বর হেনরিয়েটা রোড না বলে' আমরা সংক্ষেপে বলতুম সামন্তর শ্বশুরবাড়ী। যেন সামন্ত ও বাড়ীর গৃহজামাতা।

আমারি পাড়ার একটা অখ্যাত রাস্তায় এক সস্তা বাসায় সামন্তকে খুঁজে বের করে' সুধালুম, "কি হয়েছে?"

সামন্ত আর সে সামন্ত নয়। বড় বাড়ীর রাজচক্রবর্ত্তী ছিল, তার হুকুমে ঘরকন্না চলত। তার পরামর্শ না নিয়ে বাড়ীওয়ালী একটি দায়িত্বের কাজ করত না। সামন্ত ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। সেই আজি নামহীন মর্য্যাদাহীন ক্ষমতাহীন সামান্ত বাসাড়ে।

কান্নার মত হাসি হেসে বল্লে, "বোসো।"

কোনোমতেই ও প্রসঙ্গের ধার দিয়ে যায় না। বলে, "এমনি চলে এলুম। এই বাসা আমার পক্ষে সুবিধের। টিউবের সংলগ্ন। তুমি হবে প্রতিবেশী।"

এইটুকু ওর কাছ থেকে বের করতে পারলুম যে শিকদার একটা গ্রামোফোন কিনেছে আর তাই বাজিয়ে কলেজ কামাই করে' নোরার সঙ্গে নাচছে, সামন্তর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। সামন্ত একদিন সকাল সকাল ফিরে ও জিনিষ প্রত্যক্ষ করে' নোরার কান মলে দেয়। নোরার নালিশ শুনে তার মা সামন্তর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করে। সামন্ত বলে, কৈফিয়ৎ দাবী করার কথা যখন উঠেছে তখন বুঝতে হবে যে সে আর বিশ্বাসভাজন নয়। অনাস্থার পাত্র হয়ে সে ও বাড়ীতে টিকতে চায় না।

আমি দুঃখিতা হলুম তার বিরহের জন্যে। বিরহ—বিচ্ছেদ না। এত কালের প্রেম কি এত সহজে চুকে চায়! নোরা নিশ্চয় তার পথ চেয়ে আছে, শুধু অভিমানবশত ছুটে আসছে না। দাশগুপ্তকে ফোন করে' বল্লুম, "সামন্তকে ফিরিয়ে নাও না কেন?"

সে উত্তর দিলে, "কতবার আনতে গেছি। বলেছি নামমাত্র মাফ চাও। সে কিছুতেই মাথা হেঁট করবে না। কি করি বল?"

চাকীকে ফোনে অনুরোধ করলুম। তিনি বল্লেন, "আমি ওসবের মধ্যে নেই। ডিসগ্রেসফুল! বুড়োবয়সে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা! তাও স্বদেশে নয়।"

আমার অন্য কাজ ছিল। আর আড্ডাও তো আমার এই এক বাড়ীতে নয়। আর ভারতীয় ছাড়াও আমার অন্য বন্ধু বান্ধব ছিল। আমি আর মাথা ঘামালুম না। বলতে কি, ভুলে গেলুম।

৫

তার মাস ছয় পরের খবর। দিলে বোস।

বোসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' শিকদারও বাধালে অসুখ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নোরা একেবারে প্রাণ ঢেলে সেবা করলে। তার কয়েক মাস পরে নোরার মায়ের শ্যেন দৃষ্টিতে ধরা পড়ল নোরার মোটা হওয়া যেন সর্ব্বাঙ্গীন নয়, ঐককেন্দ্রিক। মা হঠাৎ চলচ্ছক্তি পেয়ে মেয়ের বব্ করা চুলের মুঠি ধরে' গর্জ্জে উঠলেন। "বল্ কে?"

নোরা সভয়ে বল্লে, "শিকদার।"

শিকদার নীচের তলার গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ শুনে তল্পি তল্পা গুটিয়ে উধাও।

তখন নোরার মা নিঃসহায়। ডেকে পাঠালেন সামন্তকে। সামন্ত ছুটে এলো। তিন জনে মিলে সে কি সেন্টিমেণ্টাল সীন! সামন্ত কাঁদে ভেউ ভেউ করে'। নোরা কাঁদে মিউ মিউ করে'। আর মা কাঁদে ছাত ফাটিয়ে। বোসেরা এমন ভাব দেখালে যেন তারা কিছু টের পায়নি। প্রকৃতিস্থ হয়ে নোরার মা বল্লেন এত দিন পরে সামন্ত এসেছেন বলে' তাঁর বড় আনন্দ হয়েছিল। ওটা আনন্দের ক্রন্দন।

সামন্ত ও নোরার মা গুজ গুজ ফিস ফিস করেন। সামন্ত বলে, "ও হতভাগাকে ধরে নিয়ে আসি, ওর সঙ্গে নোরার বিয়ে দাও, নোরা সুখী হলে আমিও সুখী।"

মা বল্লেন, "উহু, তুমি বিয়ে করবে না তা জানি, কিন্তু ওর হাতে পড়ার চেয়ে আইবুড় থাকা ঢের ভাল। অতএব ডাক্তার ডাক।"

সামন্তের কাজ হলো ডাক্তার খোঁজা। অক্লান্ত অন্বেষণে ডাক্তার

পাওয়া গেল। নোরা অকস্মাৎ সঙ্কটাপন্ন পীড়িত বলে' নীচের তলায় পর্দ্দানশীন হলো। বাড়ীওয়ালার অনেকগুলি টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

সামন্তের সুখ গেল বরবাদ হয়ে।

নোরার যা বরবাদ হলো তা স্বাস্থ্য, লাবণ্য, সরল বিশ্বাস।

সরীসৃপ সানুকম্প হাসি হেসে বল্লে বুর্জোয়া!"

(১৯৩৩)